দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাজেট
— পৃঃ ২৪

প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ২০২৫-'২৬-এর কেন্দ্রীয় বাজেট
— পৃঃ ২৬

৭৭ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।। ৪ ফাল্গুন, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ৪ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৭ ফেব্রুয়ারি - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

দিল্লিতে আপ-বিদায় কি করতে পারবে রাজ্যের 'পাপ বিদায়'?
শিরে সংক্রান্তি ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

আপের পরে পাপ-মুক্তি! দিদির কপালে ভাঁজটা থাকুক
☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

পরমাণুশক্তিতে ভারতের স্বনির্ভরতা ☐ ড. নিমিষ কাপুর ☐ ৮

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন : এরাজ্যের শাসকদলের জন্যও অশনিসংকেত ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

হিংসার আবহে বাংলাদেশ—এর শেষ কোথায়?
☐ প্রতীক মুখার্জী ☐ ১১

বাংলাদেশে হিন্দুর অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা—এবার হুঁশ ফেরাতে হবে সকলকে ☐ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ☐ ১৩

২০২৫-'২৬-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে পণ্য-পরিষেবার মূল্য ও কর কাঠামোর বিশ্লেষণ ☐ ড. রতন ঘোষাল ☐ ১৬

এবারের আয় করে স্বস্তি বেশি, অস্বস্তি কম মধ্যবিত্তের
☐ শেখর সেনগুপ্ত ☐ ২৩

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাজেট
☐ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ☐ ২৪

প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ২০২৫-'২৬-এর কেন্দ্রীয় বাজেট
☐ কর্নেল ড. কুণাল ভট্টাচার্য ☐ ২৬

কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেটে শিল্পক্ষেত্রের প্রসঙ্গ (এমএসএমই) এবং পরিকাঠামো উন্নয়নগত ব্যয়বরাদ্দ ☐ সুদীপ্ত গুহ ☐ ২৯

প্রণবধ্বনি ওঙ্কারই হলো শ্রীরাম
☐ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ☐ ৩১

ওপার বঙ্গের শিক্ষানুরাগী ও দানবীর মহেশ ভট্টাচার্য
☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ৩৩

ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-'২৬ এবং ভারতীয় রেল
☐ বিমল শঙ্কর নন্দ ☐ ৩৬

খেলনার বাজারে কৌশল—খেলা কখনোই ছেলেখেলা নয়
☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ৪৩

কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের ঘটনা এবারই প্রথম নয়
☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ৪৫

গল্পকথায় ডাক্তারজী ☐ বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ☐ **অঙ্গনা : ২১** ☐ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ☐ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

প্রকাশিত হবে
২৪ ফেব্রুয়ারি
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৪ ফেব্রুয়ারি
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মহাকুম্ভমেলা

মহাকুম্ভমেলা বিশ্বের এক বৃহত্তম শান্তিপূর্ণ সমাবেশ। এবারের মহাকুম্ভমেলার আয়োজন বিশ্বের মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। আয়োজকদের দাবি, ৪০ কোটির বেশি মানুষ এবার কুম্ভস্নান করেছেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভমেলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী লেখক। এছাড়াও থাকবে গঙ্গাসাগর ও হুগলী ত্রিবেণী কুম্ভের বিভিন্ন তথ্য।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments
From-

A
Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে

ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে তাহারা একজন প্রকৃত দেশভক্ত রাজনীতিকের হস্তে দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার তুলিয়া দিতে পারিয়াছে। স্বাধীনতার পরবর্তী বহু বৎসর শুধুমাত্র সঠিক পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার অভাবে দেশবাসী উন্নয়নের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ২০১৪ সালে একজন প্রকৃত দেশভক্ত স্থায়ীরূপে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর হইতে তাঁহার নেতৃত্বে ভারত বর্তমান বিশ্বে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া এক বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। সমগ্র বিশ্ব তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উচ্ছসিত প্রশংসাও করিয়াছেন। তাঁহারা ভারত সরকারের আর্থিক সংস্কারের প্রশংসা করিয়াছেন। জিডিপি'র নিরিখে ভারত বর্তমান বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ বলিয়া সমগ্র বিশ্বে পরিগণিত হইয়াছে। বর্তমান ভারত সরকার সংস্কার, কর্মপ্রচেষ্টা ও রূপান্তর এই তিনটি মন্ত্র অনুসরণ করিয়া দেশবাসীর মানোন্নয়ন এবং তৎসহিত আগামীদিনে বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নততর স্থান লাভের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করিয়াছে। দেশকে আরও উন্নত করিবার লক্ষ্যে সরকার কাঠামোগত সংস্কার প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়ন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতে সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক অর্থসংকল্প বা বাজেট প্রণয়ন এবং তাহার রূপায়ণ প্রচেষ্টা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটেও সরকারের সেই নীতিই প্রতিফলিত হইয়াছে। বর্তমান বাজেটে সরকার নীতিগত পরিবর্তন, কর্মসংস্থান, মহিলা ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, যুব সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, রেল ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়ীকরণ প্রভৃতির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়াছে। বাজেট প্রণয়নে সরকার চারটি মূল বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়াছে— দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন, যুব প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধি, কৃষকদিগকে নানাবিধ সহায়তা প্রদান এবং নারীজাতির ক্ষমতায়ন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত ১১বৎসরে ২৩ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন। ভারতের ন্যায় বিশাল জনসংখ্যার দেশে ইহা এক অভূতপূর্ব সাফল্য। যুব প্রজন্মের উন্নয়নের জন্য যুব উদ্যোগগুলির বৃহৎ সংস্থাসমূহে এক কোটি যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার করা হইয়াছে। কৃষকদের জন্য কৃষি সহায়তা ক্ষেত্রে ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। মহিলা ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে ব্যয়বরাদ্দের মাত্রা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এইকথা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বাজেটে প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতি সরকারের সমান মনোযোগ প্রতিফলিত হইয়াছে।

বস্তুত, বাজেট হইল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেশের আয়-ব্যয়ের রূপরেখা প্রণয়ন। পূর্বতন সরকারগুলির একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাহা কেবলমাত্র সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হইল, দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং তৎসহিত দেশের আর্থিক অগ্রগতি। সরকার ঘোষণা করিয়াছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বাজেট প্রণীত হইবে না। এমনকী কোনো সময়েও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনমোহিনী বাজেট অথবা নূতন কোনো প্রকল্পও ঘোষিত হইবে না। দেশবাসী ও দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যেই এই বাজেটে উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগ প্রচেষ্টা, কৃত্রিম মেধাশক্তি, খেলনা উৎপাদন শিল্প, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং গিগ অর্থনীতি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিয়াছে সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হইল ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে বিকশিত করা। স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দলগুলি যতই গালিবর্ষণ করুক না কেন, ১৪০ কোটি দেশবাসীর আশীর্বাদ প্রধানমন্ত্রীর মস্তকোপরি রহিয়াছে।

সুভাষিতম্

পরোঽপি হিতবান্ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্।। (হিতোপদেশ)

অপরিচিত ব্যক্তি যদি উপকার করে তিনি বন্ধু সমান। আর বন্ধু যদি অপকার করে তাহলে পর তুল্য। ব্যাধি শরীরে উৎপন্ন হয়েও ক্ষতি করে। কিন্তু জঙ্গলে উৎপন্ন ওষুধ শরীরের উপকার করে।

দিল্লিতে আপ-বিদায় কি করতে পারবে রাজ্যের ‘পাপ বিদায়’?

শিরে সংক্রান্তি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

দিল্লি থেকে আপ (আম আদমি পার্টি) বিদায় হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাপ (তৃণমূল শাসন)-দলের বিদায় হবে কবে? প্রশ্নটা আজগুবি। তবে প্রেক্ষিতটা অনস্বীকার্য। কেজরিওয়ালের পতনের কথা অনেকটাই জানা ছিল। দিল্লিতে আনুমানিক দেড় কোটি ভোটার। পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে সাত কোটি। দিল্লিতে ভোট দিয়েছেন ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ৯০ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে তা হতো সাড়ে চার কোটি। দিল্লির পাঁচ গুণ। সরকার পালটানোর ফারাকটা সংখ্যাতে নয়। মানুষের ইচ্ছায়। বিজেপির থেকে ১৫ শতাংশ ভোটে এগিয়ে থাকা আপ এবার ১৭ শতাংশ ভোটে পিছিয়ে পড়েছে। বিজেপি আপের থেকে ৩২ শতাংশ ভোট কেড়ে জিতেছে।

তৃণমূল বিজেপির থেকে ৭ শতাংশ ভোটে এগিয়ে রয়েছে। আপের শোচনীয় পরিণতি এটা নিশ্চিত করে না যে মমতার ৭ শতাংশের ব্যবধান ২০২৬-এর রাজ্য ভোটে বিজেপির কোলে ১৭ শতাংশ বাড়তি হয়ে পড়বে না।

নভেম্বরে বিহারের ভোট। বিজেপির জয় মমতার শিরে সংক্রান্তি। দিল্লিতে বিজেপির জয় নিশ্চিতভাবে কোনো ব্যক্তির নয়। সমাজ মাধ্যম তাই তুলে ধরতে চায়। বিজেপি সেরকম দাবি করে না। কেজরিওয়াল বা মমতার ক্ষেত্রে পটভূমি উলটো। তাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল। ভোট ঘোষণার আগে থেকেই বেশ কিছু সামাজিক সংগঠন দিল্লিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছিল। কয়েক মাস আগে এই সাংগঠনিক তৎপরতাই হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রবাদী শক্তির জয় সুনিশ্চিত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে তেমন ম্যাজিক ঘটতেও পারে। তবে দল হিসেবে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও দিল্লি বিজেপির মতো বঙ্গ বিজেপিকেও কোমর বাঁধতে হবে। দিল্লির ভোট প্রমাণ করেছে আঞ্চলিক দলগুলি লম্বা দৌড়ের ঘোড়া নয়। ডিএমকে-র মতো কিছু দল ব্যতিক্রম হলেও তৃণমূল কোনোভাবেই তার মধ্যে পড়ে না। কারণ তৃণমূলের ভিত্তি যতটা বামেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার থেকে বেশি খয়রাতিতে। বেআইনি চিট ফান্ডের ‘ডিপ স্টেটে’। মমতার উত্থান কেজরির মতো ভুঁইফোড় নয়। তবে আয়ু সীমিত। দিল্লির ভোটে শূন্যের হ্যাটট্রিক করেছে কংগ্রেস আর সিপিএম বাষ্প হয়ে উবে গিয়েছে। রাজ্য ভোটের আগেই দলের ভিতরে বাইরে রাজনৈতিক পাটিগণিত কষছেন মমতা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপাতত ভ্যানিশ করে দিয়েছেন। দলের বৃদ্ধদের মন রাখতে পরামর্শদাতা সংস্থাকে ক্রিয়াহীন করে দিয়েছেন। দলের ভিতর থেকেই তাদের চোর ও তোলাবাজ বলা হচ্ছে। অথচ সন্দেশখালিতে তার ভাষণে তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

অনেক কংগ্রেস নেতাকে বলতে শুনেছি তৃণমূল ‘ঝুল্লিপট্টির’ দল। প্রয়াত এক নেতা ঠাট্টা করে বলতেন, প্রয়োজনে তৃণমূল কলকাতা কর্পোরেশনের বিষ্ঠা ফেলার গাড়ি বিক্রি করে টাকা তুলবে। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন, মন্ত্রীও হন।

আপাতত অভিষেকবাবুকে স্বাস্থ্য সেবার কাজে লাগানো হয়েছে। আনুমানিক অর্ধশতাব্দী বা তারও বেশি সময় ধরে রাজ্যের মানুষ পাপ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছে। মমতা জমানায় সেই বোঝা ভারী হয়েছে। সে বোঝার সঙ্গে অগ্রবর্তী সরকারদের তৈরি বোঝার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর কন্যাশ্রীর মতো সামাজিক অনুদান প্রকল্প ছড়িয়ে মমতা জিতে যাচ্ছে এটা অতি সরলীকরণ। নিন্দুকেরা বলছেন, দিল্লিতে বিজেপিকে কংগ্রেস জিতিয়েছে ১৪ আসনে ভোট কেটে। আর সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে মমতাকে জেতানোর জন্য বিজেপিকে হারিয়েছে ১২ আসনে ভোট কেটে।

মমতার নতুন ভোজবাজির স্যাঙাত সিপিএম। আসন্ন রাজ্য ভোটে বিজেপিকে লড়তে হবে সিপিএম আর তৃণমূলের সঙ্গে। দুইয়ে মিলে আনুমানিক ৫০ শতাংশ ভোট। বিজেপিকে এই রাজ্যে ‘প্রধান শত্রু’ বলে চিহ্নিত করেছেন দলের এখনকার সর্বভারতীয় কোঅর্ডিনেটর তাদের খসড়া রাজনৈতিক প্রতিবেদনে। বিদেশি বামেদের সঙ্গে পাওয়া আর ‘ফুটো ব্যাগে পয়সা রাখা’ সমান। বামেরা এখন ‘জব্দ বাম’। মমতার দুর্দশা চিত্র প্রকট। তাঁর দুয়ারে সরকার প্রকল্পে বামেদের প্রকাশ্য অংশগ্রহণ তার প্রমাণ। ঘটনাটি কাকতালীয় নয় আর ঠিক সেই কারণেই এটা বোঝা যাচ্ছে যে বিজেপির জয় মানে মমতার শিরে সংক্রান্তি। সে যেখানেই হোক।

> মহাকুম্ভমেলায় যাননি মমতা। তার এক সাংসদ স্নান করেছেন। মুসলমান ভোট বড়ো বালাই, তাই চাইলেও মমতা সনাতনী হিন্দু হতে পারবেন না।

এখন অবধি মহাকুম্ভমেলায় যাননি মমতা। তার এক সাংসদ স্নান করেছেন। মুসলমান ভোট বড়ো বালাই, তাই চাইলেও মমতা সনাতনী হিন্দু হতে পারবেন না। অঘটন যার সঙ্গী সেই সাধ্য কি তার হবে? হলেও তা হবে ‘বিষকুম্ভ’। অমৃতকুম্ভ নয়।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

আপের পরে পাপ-মুক্তি! দিদির কপালে ভাঁজটা থাকুক

কপালেভাঁজেষু দিদি,

দিল্লি বিধানসভা বিজেপি দখল করেছে। আপ বাপ বাপ করে পালিয়েছে। দুর্নীতির শিখরে পৌঁছে যাওয়া একটি রাজ্যের যা পরিণতি হওয়ার তাই হয়েছে। কিন্তু দিদি, আপনি তাতে এত ভয় পেয়ে গেলেন কেন? আপনার কপালে ভাঁজ দেখা যাচ্ছে কেন? দুর্নীতিতে আপের থেকেও এগিয়ে থাকা পশ্চিমবঙ্গের দখল রাখা কঠিন বলেই কি মনে করছেন আপনি?

চিন্তায় যে আছেন সেটা আপনি মুখে স্বীকার করবেন না তা আমি জানি। আপনাকে এই ভাই যে খুব ভালো চেনে। কিন্তু দিদি, চিন্তাটা আপনি নিজেই প্রকাশ করে ফেলেছেন। দিল্লির ফল প্রকাশের পরে পরেই দলের বিধানসভায় তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করেন আপনিই। দিল্লির ফল প্রকাশের পর তখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি আপনি। কিন্তু আপনি জানতেন দলের বিধায়করা ভয় পাচ্ছেন। সেটা বুঝেই আপনি বৈঠকে বিধায়কদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'ও সব ভাবার দরকার নেই। ২৬-এ আমরা দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে ক্ষমতায় ফিরব।' ভয় ভালো দিদি, কখনো কখনো ভয় ভালো। তাতে আগে থেকে সতর্ক হওয়া যায়। যদিও সতর্ক হয়েও কোনো লাভ রয়েছে কিনা তা নিয়ে আমি অন্তত নিশ্চিত নই।

দেখুন, দিল্লির ফলের জন্য অনেক বড়ো অবদান আপ এবং তার নায়ক কেজরিওয়ালের। এই পরাজয় প্রথমত এবং প্রধানত তাঁদের নিজকীর্তির পরিণাম। আবগারি দুর্নীতি এবং অন্যান্য অনাচারের অভিযোগকে ভোটাররা ভালো চোখে দেখেননি। যেখানে 'সততা'-ই মূলধন হিসেবে আপের জন্ম। এই ব্যাপারে আপনার দল দিদি, তৃণমূলের অনেক মিল। তাই ভয় করে।

'আম আদমি'র জীবনযাপনের ধ্বজাধারী কেজরিওয়ালের বহুমূল্য আবাসটিও জ্বলন্ত বাস্তব। অন্যদিকে, নাগরিক পরিকাঠামোর উন্নতি ক্রমশ স্তিমিত হয়েছে, পরিবহণের সমস্যা এবং দূষণের মাত্রা চরমে পৌঁছেছে। এই সংকটের দায় আপ সরকার কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাজধানীর নাগরিকরা অনেকেই হয়তো ক্লান্ত হয়ে ভেবেছেন, তার থেকে 'ডাবল ইঞ্জিন'ই শ্রেয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের একক নেতৃত্বের দাপট এবং অসহিষ্ণুতা, যা তাঁর অনেক সহকর্মীর সঙ্গে দূরে সরিয়ে দিয়েছে বহু নাগরিককেও। নির্বাচনী সাফল্য এবং তজ্জনিত ক্ষমতা বোধ হয় তাঁর বা তাঁর সতীর্থদের মাথায় ঢুকে গিয়েছিল, যার ফলে জনসংযোগের স্বধর্ম ভুলে তাঁরা 'সরকারি দল' হয়ে ওঠেন। এই পরাজয় সেই প্রবণতাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। দিদি, একই অবস্থা তো তৃণমূলেরও। বিশেষ করে ভাইপো-বাহিনী তো এটাই করে চলেছে।

> **মনে রাখবেন, পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালে গোটা রাজ্যের বাকি প্রায় ৬৭ শতাংশ হিন্দু জনগণের মাত্র ১৫ শতাংশের ভোট পেয়েছেন আপনি। এর ৫ শতাংশ বিমুখ হলেই আপনার হাল আপ হয়ে যাবে! তাই ভয় পাওয়াই ভালো। কপালের ভাঁজটা থাকুক।**

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বা আসন বোঝাপড়া না করার পিছনেও অসহিষ্ণুতার ভূমিকা আছে, যদিও সেই অসহিষ্ণুতার দায়ভাগ রাহুল গান্ধী ও তাঁর সতীর্থরাও এড়াতে পারেন না। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে 'ইন্ডিয়া'র সর্বভারতীয় অঙ্ক যাই-ই হোক না কেন, দিল্লির নিজস্ব রাজনীতিতে আপ ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক মিত্রতার প্রশ্ন ওঠে না এবং সেই কারণেই নেতারা বোঝাপড়া করলেও দুই পক্ষের কর্মী বা ভোটদাতারা তাতে কতটা সাড়া দিতেন, তা নিয়ে গভীর সংশয় আছে। নির্বাচনী পাটিগণিত অবশ্যই মূল্যবান কিন্তু নির্বাচন কেবলই পাটিগণিত নয়। দিল্লিতে ব্যর্থ কংগ্রেস এবং পরাস্ত আপ দুই দলকেই আপাতত জনসাধারণের কাছে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তোলার পথ খুঁজতে হবে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং রাহুল গান্ধী নিশ্চয়ই জানেন যে বিজয়ী বিজেপি সেই কাজটিকে সহজে হতে দেবে না।

দিদি, এই রাজ্যের কথা বলি। আপনার তো জোটের প্রশ্নই নেই। কংগ্রেস আর সিপিএম জোট করে আছে। তবে সেই জোট থাকল না গেল তাতে পশ্চিমবঙ্গের আর কিছু এসে যায় না। শূন্য আর শূন্য যোগ করলে তো ফলটা শূন্যই হয়। ফলে এবার আপনার লড়াই শুধু এবং শুধু বিজেপির সঙ্গে।

লোকসভা নির্বাচনে ২৯টি আসন জিতেও রাজ্যের মোট ভোটের ৪৫.৭৬ শতাংশ পেয়েছে আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে বিজেপি মাত্র ১২টি আসন জিতে ভোট পেয়েছে ৩৮.৭৩ শতাংশ। যার অর্থ, বিজেপির থেকে মাত্র সাত শতাংশ বেশি ভোট পেয়েছে তৃণমূল। দিদি, এটা মনে রাখতে হবে যে, বিজেপির যদি চার শতাংশ ভোট বাড়ে, তা হলে উলটো দিকে তৃণমূলের চার শতাংশ ভোট কমে গিয়ে ব্যবধান শূন্যতে নেমে আসবে। মনে রাখবেন, পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালে গোটা রাজ্যের বাকি প্রায় ৬৭ শতাংশ হিন্দু জনগণের মাত্র ১৫ শতাংশের ভোট পেয়েছেন আপনি। এর ৫ শতাংশ বিমুখ হলেই আপনার হাল আপ হয়ে যাবে! তাই ভয় পাওয়াই ভালো। কপালের ভাঁজটা থাকুক।

অতিথি কলম

ড. নিমিষ কাপুর

পরমাণুক্ষেত্রে ভারতের স্বনির্ভরতা

১৯৪৮ সালে ড. হোমি জাহাঙ্গির ভাবার নেতৃত্বে পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ভারতে পরমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান । ১৯৭৪ সালে পোখরানে প্রথম এবং ১৯৯৮ সালে দ্বিতীয়বার পারমাণবিক পরীক্ষণ পরমাণুক্ষেত্রে ভারতের স্বনির্ভরতা ও সুরক্ষার প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়। ভারতের উদ্দেশ্য অনন্ত শক্তির প্রবাহকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের বৈশ্বিক শক্তিকে আরও সুদৃঢ় করা। এই লক্ষ্য বিশ্ব প্রবণতার অনুরূপ পরমাণু, বায়ু, সৌর ও জলবিদ্যুতের মতো কম কার্বন নিঃসরণ প্রণালীর দিকে অগ্রসর হওয়া। এই পথেই ভারত নিজের পরমাণু শক্তিক্ষেত্রকে আরও দ্রুততার সঙ্গে উন্নতির মাধ্যমে সার্বজনিক ও ব্যক্তিগত অংশীদারিত্বের লাভ সংগ্রহের পরিকল্পনা করছে, যাতে ২৬ বিলিয়ন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের লক্ষ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

ভারত ২০৪৭ সাল পর্যন্ত নিজস্ব পরমাণু বিদ্যুৎশক্তিকে ৭.৫ গিগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১০০ গিগাওয়াটে পৌঁছানোর বড়ো লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। পরমাণু শক্তি বিভাগ ব্রিডার রিঅ্যাক্টর (পরমাণু চুল্লি)-এর মাধ্যমে ৩ গিগাওয়াট শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করছে। তার সঙ্গে অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় ১৭.৬ গিগাওয়াট উৎপাদনে সক্ষম হালকা রিঅ্যাক্টর এবং ৪০-৪৫ গিগাওয়াটের জন্য চাপ-প্রযুক্ত ভারী জল রিঅ্যাক্টর বসানোর পরিকল্পনাও চলছে। ভারতের উদ্দেশ্য ২০৩১-'৩২ সাল পর্যন্ত নিজস্ব পরমাণু বিদ্যুৎশক্তিকে ৮,১৮০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ২২,৪৮০ মেগাওয়াট করার, যাতে গুজরাট, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে ৮,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১০টি রিঅ্যাক্টর নির্মাণের বিষয়টিও রয়েছে।

গবেষণা ও বিকাশে দিশা নির্দেশ ঃ ১৯৪৮ সালে ড. হোমি জাহাঙ্গির ভাবার নেতৃত্বে ভারত সরকার পরমাণু শক্তি কমিশনের গঠন করে, যার উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় পরমাণু শক্তি সম্পর্কিত কাজে দিশা নির্দেশ করা এবং তার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা। এই কমিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা, যার মধ্যে রয়েছে শক্তি উৎপাদন, চিকিৎসা ও শিল্পক্ষেত্রের গবেষণা। ড. হোমি ভাবাকে এই কমিশনের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। তাঁকে ভারতীয় পরমাণু ক্ষেত্রের পিতামহ মনে করা হয়। পরমাণু প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়কে কমিশন প্রাধান্য দেয়, যার ফলস্বরূপ ১৯৫৭ সালে ভারতের প্রথম পরমাণু রিঅ্যাক্টর 'অপ্সরা' নির্মাণ করা হয়। এর সঙ্গে ভারতে পরমাণু শক্তির উপর গবেষণার জন্য ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনা করা হয়। ১৯৫৪ সালের ৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরমাণু শক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পরমাণু শক্তি বিভাগ গঠন করা হয়। ১৯৫৮ সালের ১ মার্চ পরমাণু শক্তি কমিশনকে সরকার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘোষণা করে এবং আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করে।

পরমাণু শক্তি বিভাগ পরমাণু শক্তির দ্বারা পরিচালিত সমস্ত বৈদ্যুতিক ও অবৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে কাজ করে। পরমাণু শক্তির অন্যান্য শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে স্বাস্থ্য, খাদ্য ও কৃষিক্ষেত্র এবং পরিবেশ রক্ষায় বিকিরণ প্রযুক্তি বিষয়ক কাজে পরমাণু শক্তি বিভাগের বিশেষ পরিচিতি গড়ে উঠেছে।

পোখরান প্রথম পরীক্ষণের ৫০ বছর ঃ ভারতের পরমাণু পরীক্ষণ, বিশেষ করে পোখরান প্রথম ও দ্বিতীয় ভারতীয় প্রতিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক রূপে রয়েছে। এই দুটি পরমাণু পরীক্ষণ শুধু ভারতের পরমাণু বিষয়ক প্রকল্পকে সমৃদ্ধ করেনি, বরং দেশের শক্তি ও সুরক্ষানীতিকেও প্রভাবিত করেছে।

১৯৬০-এর দশকে যখন পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ চুক্তির বিষয় চলছিল, ভারত এটিকে পক্ষপাতগ্রস্ত ব্যবস্থা বলে বিরোধিতা করে। ভারতের মতে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ চুক্তি অনুযায়ী কিছু দেশকে পারমাণবিক অস্ত্রের অনুমতি দেওয়া হয়, অপরদিকে অন্যান্য দেশকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। ভারতীয় পরমাণু বিজ্ঞানী ড. হোমি ভাবার যুক্তি ছিল, ভারতকে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক পরীক্ষণের কাজ চালিয়ে যেতে হবে, যাতে মানব কল্যাণে পরমাণু শক্তির ব্যবহার করা যায়।

১৯৭৪ সালের ১৮ মে পোখরানে প্রথমবার পারমাণবিক পরীক্ষণ করা হয়। এই পরীক্ষণকে 'স্মাইলিং বুদ্ধ' নাম দেওয়া হয়েছিল। এটি পাকিস্তান ও চীনের কাছ থেকে ভারতের সুরক্ষার বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা ছড়িয়ে দেয়। এই পরীক্ষণে কেবলমাত্র একটি ফিউশন ব্লাস্ট হয়, যাতে ১২ কিলোটন টিএনটি বিস্ফোরণের সমান শক্তি উৎপন্ন হয়। এই পরীক্ষাকে 'শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক বিস্ফোরণ' বলা হয়, যা প্রকৃত অর্থে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষমতা প্রদর্শন। এই পরীক্ষণের মাধ্যমে ভারত পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ দেশের শ্রেণীতে যুক্ত হয়।

এই পরীক্ষণের পর ভারতকে বৈশ্বিকস্তরে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমেরিকা-সহ অন্যান্য পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ভারতের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যাতে ভারত পারমাণবিক ক্ষেত্রের কাজে প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেতে না পারে। ১৯৭৫ সালে আমেরিকা নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপ গঠন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক সামগ্রী ও প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা। এর পরে ভারতের উপরে পারমাণবিক পরীক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

১৯৯৮ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেসময় পোখরানে দ্বিতীয় পরীক্ষণ হয়, একে 'অপারেশন শক্তি' নাম দেওয়া হয়। ১১ থেকে ১৩ মে তারিখের মধ্যে

এই পরীক্ষণে মোট পাঁচটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ করা হয়। তার মধ্যে একটি ফিউশন আর চারটি ফিশন বিস্ফোরণ। এই পরীক্ষণটি ছিল পূর্ববর্তী পরীক্ষণের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, কেননা এতে ৪৫ কিলোটন টিএনটি বিস্ফোরণের সমান শক্তি উৎপন্ন হয়। এই পরীক্ষণের মাধ্যমেই ভারত তার পারমাণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে নেয় এবং এখান থেকেই এক নতুন পারমাণবিক নীতির সূত্রপাত ঘটে। ভারত নিজের থেকেই পারমাণবিক পরীক্ষণ বন্ধ রাখার ঘোষণা করে এবং ভবিষ্যতে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ করবার কথা জানায়। এই পদক্ষেপের কারণে ভারত স্থায়ীরূপে পারমাণবিক শক্তিধর দেশের সূচিতে সংযুক্ত হয়। ভারত শুধু পরমাণু শক্তিধর রূপেই উঠে এসেছে তা নয়, বরং পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ, ব্যবহার এবং তার প্রযুক্তিগত বিকাশে সমর্থ হয়ে উঠেছে। এই পরীক্ষণ পাকিস্তান ও চীনের কাছে একটা কড়া বার্তাও বটে, কেননা ভারত এখন পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশ।

দেশের পারমাণবিক শক্তির পরিমাণ বিস্তারের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে যে, ভারত ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রয়োজনীয়তাগুলিকে স্বচ্ছ, নিম্ন-কার্বন শক্তি কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা ঃ পারমাণবিক শক্তিকে স্বচ্ছ শক্তি প্রযুক্তি রূপে বর্ণনা করা হয়, কারণ পারমাণবিক শক্তিক্ষেত্রে শূন্য কার্বনডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে। পারমাণবিক শক্তি জীবাশ্ম জ্বালানি জ্বালানোর মতো বায়ুদূষণ ছড়ানো থেকেও দূরে থাকে। ভারতে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে এবং আগামী সময়ে এর প্রভাবও স্পষ্ট। বিগত তিন বছরে পারমাণবিক শক্তি যন্ত্রপাতি থেকে মোট ১,১৫,২৯২ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। পারমাণবিক শক্তি বিভাগের লক্ষ্য ভারতের বর্তমান পারমাণবিক শক্তির পরিমাণকে ২০৩১-'৩২ সালের মধ্যে তিনগুণ বৃদ্ধি করা। বর্ষ ২০৩১-'৩২ পর্যন্ত বর্তমানের পারমাণবিক শক্তি ৮,১৮০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ২২,৪৮০ মেগাওয়াটে পৌঁছে যাবে। পারমাণবিক শক্তি বিভাগ ভারতে ক্যাপটিভ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য ২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চাপ-প্রযুক্ত ভারী জল রিঅ্যাক্টরের (পিএইচডব্লুআর) নকশা করছে, যার ব্যবহার হালকা রিঅ্যাক্টরে (বিএসএমআর) করা হবে। এর সঙ্গে ভারত হালকা জলভিত্তিক রিঅ্যাক্টরের জায়গায় ২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন হালকা মডিউলর রিঅ্যাক্টরের (বিএসএমআর) উপরেও কাজ করছে। পারমাণবিক র‍্যাক্টর ডিজাইনে একটা পরিবর্তন করা চলছে, যার মাধ্যমে ক্যালেন্ড্রিয়া-কে (পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরে নিউট্রনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে) প্রেসার ভেসেল থেকে (রিঅ্যাক্টরের ভিতর চাপ ধরে রাখতে এবং জ্বালানিকে সুরক্ষিত রাখতে কাজ করে) প্রতিস্থাপিত করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ক্ষমতা ঃ বিগত ১০ বছরে ভারতের পারমাণবিক শক্তি ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-'১৪ সালের ৪,৭৮০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে বর্তমানে ৮,১৮০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদনও ২০১৩-'১৪ সালের ৩৪,২২৮ মিলিয়ন ইউনিট থেকে বেড়ে ২০২৩-'২৪ সালে ৪৭,৯৭১ মিলিয়ন ইউনিটে পৌঁছে গেছে। বর্তমানে দেশের মোট স্থায়ী পারমাণবিক শক্তি ৮,১৮০ মেগাওয়াট।

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্যবহার ঃ পারমাণবিক শক্তি ও বিকিরণ প্রযুক্তির ব্যবহার বর্তমানে আমাদের জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মজবুত পরিবর্তন আনছে। এই প্রযুক্তি শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়, বরং কৃষি, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ যোগদান দিয়ে চলেছে, যার ফলে জীবনস্তরেই শুধু উন্নতি হয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে দেশের শক্তি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাও সুদৃঢ় হয়েছে। পারমাণবিক শক্তি বিভাগের আগে আরও নতুন পরিবর্তনের দিশাতে অত্যাধিক প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে। শক্তি সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য সুরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়ো ফার্মাসিউটিকলস এবং পরমাণুচিকিৎসা, কৃষি ও খাদ্য সংরক্ষণের উপরও পারমাণবিক শক্তি বিভাগ কাজ করছে।

কৃষি ক্ষেত্রে বিকিরণের দ্বারা উৎপন্ন জিনগত পরিবর্তন প্রণালীর মাধ্যমে সৃষ্ট ৭০ প্রকারের বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ রয়েছে, যার মধ্যে তিল, ডাল, ধান, পাট প্রভৃতি ফসলের বিভিন্ন প্রকার জাত য়েছে। এছাড়া ভারতে বহু ইর‍্যাডিয়েশন প্ল্যান্টস স্থাপন করা হয়েছে, যার ব্যবহার কৃষি উৎপাদনে জীবনীশক্তি বাড়ানোর জন্য করা হচ্ছে। আম, বেদানা প্রভৃতি ফল এবং পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি সবজি এখন বিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘসময় পর্যন্ত তরতাজা রাখা হয়। এর ফলে কৃষকদের লাভও যেমন হচ্ছে, তেমনি খাদ্য সুরক্ষাও হচ্ছে।

পারমাণবিক শক্তি ও বিকিরণ প্রযুক্তির স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রেও অত্যধিক প্রভাব রয়েছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত রেডিয়ো আইসোটোপসের সাহায্যে বহু মারাত্মক রোগ, বিশেষ করে ক্যানসারের উপসর্গ নির্ধারণ ও চিকিৎসা করা হচ্ছে। ভারতে ২২০-র বেশি পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে, যেখানে রেডিয়ো ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবহার করা হচ্ছে। যা কিনা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও ক্যানসারের বিষয়ে গবেষণায় সাহায্য করে। এছাড়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত ফসফরাস, সামেরিয়াম ও লিউটেটিয়াম ভিত্তিক রেডিয়ো ফার্মাসিউটিক্যালসও ক্যানসার রোগীদের যন্ত্রণাতে স্বস্তি দেয় এবং নিরাময়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। বিকিরণ প্রণালীর ব্যবহার এখন এই ক্ষেত্রে আরও লাভজনক হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, লিউটেটিয়াম-১৭৭সংযুক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল দ্বারা নিউরোএন্ডোক্রাইন ক্যানসারের চিকিৎসা ব্যয় আমদানি করা রেডিয়ো ফার্মাসিউটিক্যালসের তুলনায় ১০-১৫ ভাগ কম হয়, যা গরিব ও মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে স্বস্তির কারণ।

বৈশ্বিকস্তরে প্রশংসা ঃ ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশন ভারতের পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প এবং তার অদ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে লিখেছে, ৩৪ বছর পর্যন্ত নিউক্লিয়ার নন-প্রোলিফেরেশন ট্রিটি থেকে বাইরে হওয়া সত্ত্বেও ভারত পারমাণবিক শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধিতে যে নমনীয়তা ও নতুন পরিবর্তনের পথ দেখিয়েছে, তা প্রশংসনীয়।

দেশের পারমাণবিক শক্তির পরিমাণ বিস্তারের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে যে, ভারত ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রয়োজনীয়তাগুলিকে স্বচ্ছ, নিম্ন-কার্বন শক্তি কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারত পারমাণবিক শক্তিতে নতুন পরিবর্তনের বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যা দীর্ঘকালীন শক্তি সুরক্ষাকে নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে আমদানিকৃত ইউরেনিয়ামের উপর নির্ভরশীলতাকেও কমিয়ে আনে।

(লেখক যোগাযোগ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, ভারত সরকার)

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন

এরাজ্যের শাসকদলের জন্যও অশনিসংকেত

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। সারা ভারতের সঙ্গে রাজধানীর মানুষও যেন ঢেলে আশীর্বাদ করেছিল বিজেপিকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ধরেই নিয়েছিলেন, ১৭ বছর পর দিল্লির কুর্সি দখল বিজেপির শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ভারতের রাজধানীর রাজনীতিতে যেন উলটপুরাণ। যে বিজেপি সাতে সাত করেছিল লোকসভা নির্বাচনে, কয়েকমাসের ব্যবধানে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে তারাই পেল মাত্র তিনটি আসন। প্রতিপক্ষ আম আদমি পার্টি ৬৭টি আসন নিয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়ে রাজধানীর মসনদে এসেছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও ছবিটা বিশেষ বদলায়নি। বিজেপি সারা দেশের সঙ্গে রাজধানীতেও খুব ভালো ফল করলো, এবারও তারা সাতে সাত। কিন্তু কিছুদিন বাদেই বিধানসভা নির্বাচনে ফের মুখ থুবড়ে পড়লো বিজেপি। তারা পেল মাত্র ৮টি আসন। প্রতিপক্ষ আপ ৬২টি।

ফলে গত বছরও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সাতে সাতের পরও এবার আপকে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী সমীক্ষায় এগিয়ে রাখছিলেন বিশ্লেষকরা। কিন্তু তাঁদের সব হিসেব-নিকেশ গুলিয়ে এবার আর বিজেপিকে নিরাশ করেনি রাজধানীর জনতা। দুহাত ভরে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন তাঁরা। তাই এবার বিজেপির ঝুলিতে ৪৮টি আসন। আর আপের ২২টি। ফলে দশ বছর আগেই যা আশা করা গিয়েছিল, দশ বছর পেরিয়ে হলো সেই স্বপ্নপূরণ।

সাতাশ বছর পর দিল্লির ক্ষমতায় ফিরল বিজেপি। হেরে গিয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ-সুপ্রিমো কেজরিওয়াল। নয়া দিল্লি আসনে চার হাজার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির প্রবেশ ভার্মার কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি। অন্যদিকে জংপুরায় পরাজিত হয়েছেন আপের আরেক স্তম্ভ মনীশ সিসোদিয়াও। কোনোক্রমে মাত্র সাতাশশো ভোটে কালকাজি আসনে জিতে মুখরক্ষা করেছেন দিল্লির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতিশী মারলেনা। কিন্তু পরাজিত তাবড় আপ নেতারা যেমন সৌরভ ভরদ্বাজ, সত্যেন্দ্র জৈন প্রমুখ।

গত দুবারের লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যেটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ বিভিন্ন রাজ্যে যে প্রবণতা আগেও দেখা গিয়েছে— সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নির্বাচনে সুবিধা পাবে বিজেপি, কিন্তু বিধানসভায় অ্যাডভানটেজ আপ। কিন্তু এবারে আপের কেন এভাবে ভরাডুবি হলো? মনে রাখতে হবে, আম আদমি পার্টি শুধু সংখ্যার বিচারেই হারেনি। যে সমস্ত তাবড় আপ নেতাদের লোকে এক ডাকে চিনতো, যাঁদের বিপুল ভোটে জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে ধরা হচ্ছিল, তাঁরাও বিজেপির অখ্যাতদের কাছে হেরে গিয়েছেন। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা প্রথমেই যেটা মনে করছেন, একদা আন্না হাজারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে আবগারি দুর্নীতির অভিযোগে জেলে যাওয়া ভালোভাবে নেয়নি মানুষ। তখন মুখ বাঁচাতে বিরোধীদের তরফ থেকে প্রচার করা হচ্ছিল, এটা নাকি প্রতিহিংসার রাজনীতি, লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেজরিওয়ালকে আটক করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পর এবার বিধানসভা নির্বাচনও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিল, ভুক্তভোগী দিল্লির মানুষের বিশ্বাস কেজরিওয়ালকে জেলে ভরে এনডিএ শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার কোনো প্রতিহিংসার রাজনীতি করেনি। বরং আইনকে আইনের পথেই চলবার সুযোগ করে দিয়েছে।

মধ্যবিত্ত মূল্যবোধই এবার দিল্লিতে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে, ভারতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যেটা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তাঁরা এও দাবি করছেন যে, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে গেমচেঞ্জার বা কিংমেকার্স হচ্ছে 'মিডল ক্লাস' বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, মধ্য ও নতুন দিল্লির যে সকল আসনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব বেশি, তার বেশিরভাগেই জিতেছে বিজেপি।

তাঁদের বক্তব্য, বায়ুদূষণ থেকে জলদূষণ, পরিকাঠামোগত সেভাবে কোনো উন্নয়ন না হওয়া আপ সরকারের প্রতি বিমুখ করেছে মধ্যবিত্তকে। অন্যদিকে এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড় বিজেপিকে সুবিধা দিয়েছে। তাছাড়া অষ্টম পে কমিশনের ঘোষণাও বিজেপিকে দিল্লিবাসী সরকারি কর্মীদের কাছে আস্থা জুগিয়েছে। কারণ দিল্লিতে বিপুল সংখ্যক ভোটার সরকারি কর্মী রয়েছেন।

পাশাপাশি বাঙ্গালি-সহ পূর্ব ভারতের ভোটাররাও আপের থেকে মুখ ফিরিয়ে এবার বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে। এরকম ২৫টি আসনে বিজেপি জিতেছে, যেখানে বাঙ্গালি, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে আসা ভোটারদের প্রভাব বেশি। এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ৩২৩টি বাঙ্গালি অধ্যুষিত বুথের মধ্যে যে ৩০৬টিতেই এগিয়ে বিজেপি। সব মিলিয়ে এই নির্বাচনী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবল অস্বস্তি ঢাকতে ভোট-শতাংশের বিচারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের জন্য লড়াই করা আপ-কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধীরা একে অপরকে দুষে রাজধানীতে বিগত সাতাশ বছরের অপকর্ম ঢাকতে চাইছে। এই ফলাফল আরও একটা জিনিস স্পষ্ট, গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ফল আগের থেকে খারাপ হলেও শহরাঞ্চলে, যেখানে মধ্যবিত্ত ভোটার বেশি, সেখানে রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের মাটি সরে গিয়েছে। এবং দিল্লির মতোই এখানকার শাসকদলের সীমাহীন দুর্নীতিতে আপামর মানুষ বিরক্ত। দেওয়াল-লিখন সুস্পষ্টভাবে পড়া যাচ্ছে। □

হিংসার আবহে বাংলাদেশ এর শেষ কোথায় ?

প্রতীক মুখার্জী

যে কোনো মানুষকে মনের জোর দিতে একটি কথা বলা হয় যে, 'আপনার দুর্বলতাগুলিকে শক্তিতে রূপান্তরিত করুন'। তবে কোথাও নিজের দুর্বলতাগুলিকে মিথ্যাচার দ্বারা ঢেকে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াস করার কথা কোথাও লেখা আছে বলে জানা নেই। হাস্যকর হলেও সত্য যে প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে এই ধরনের মিথ্যাচারের নমুনা আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশের নানান মহল থেকে বলা হচ্ছে যে ভারতীয় পণ্যের ক্রেতা হিসেবে ভারতের উচিত বাংলাদেশকে 'তোয়াজ' করে চলা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, বাস্তবতাটা ঠিক কীরকম? যে কোনো দেশের কাছেই নিজ দেশীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হলো বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের একটি মাধ্যম। কিন্তু তাই বলে স্থলপথে তিনদিকের প্রায় পুরোটাই ভারত দ্বারা বেষ্টিত বাংলাদেশ যদি সেই প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকে জল ও স্থলপথে মেসোপটেমিয়া, ইরান-সহ বিশ্বের নানান প্রান্তে আবহমানকাল ধরে বাণিজ্য করে আসা ভারতকে, ভারতীয় পণ্য কেনার জন্য তাদের তোয়াজ করতে বলে, তবে তা বাস্তবতা বিবর্জিত তো বটেই, উপরন্তু বাংলাদেশি নাগরিকরা চিকিৎসা-সহ নানান কারণে ভারতে এসে যখন কলকাতার নিউমার্কেট-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে অতি প্রচলিত পণ্যও ব্যাগ ভর্তি করে কিনে নিয়ে যান তখন তা তাঁদের অভ্যন্তরীণ বাজারেরও দৈন্যদশা প্রকাশ করে।

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে নবগঠিত বাংলাদেশের দায়িত্বভার নেওয়ার পর ভারতে এসে কলকাতার ব্রিগেডে এক জনসভায় বলেছিলেন 'হিন্দু হামারা দুশমন হ্যায়', কাশ্মীরকো ফতে করনা হ্যায়'এর মতো সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা ব্যতীত পাকিস্তানের আর কোনো মতাদর্শ নেই। তিনি এই ধরনের ইসলামি কট্টরপন্থা সর্বসম্মুখে বর্জন করে ঘোষণা করেছিলেন 'জাতীয়তাবাদ', 'সমাজতন্ত্র', 'গণতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'ই হবে বাংলাদেশের মূলমন্ত্র। তারপর থেকে গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। মুজিবের জায়গায় আজ বাংলাদেশে বীরের মর্যাদা পাচ্ছে সপরিবারে মুজিব হত্যার অন্যতম খলনায়ক সেই মেজর ডালিম। বিশ্ব রাজনীতিতে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের মতো ঘটনার নজির বহু রয়েছে। স্বাধীন পার্বত্য রাজ্য ভুটানে প্রতিবেশী চীনা ড্রাগনের কালো ছায়া প্রতিনিয়তই দেখা যায়। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি ভুটানের অভ্যন্তরে পরিকাঠামো নির্মাণ করে তাদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করছে প্রতিনিয়ত।

সেদিন হয়তো বেশিদূরে নেই যেদিন বাংলাদেশের নিরপরাধ, নিপীড়িত মানুষের চোখের জলেই লিখিত হবে জেহাদি মোল্লাবাদীদের ধ্বংসের উপাখ্যান। যে টেবিলে ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্কের ফলস্বরূপ একাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, আগামীতে সেই টেবিলেই হয়তো নিজেদের ভুলের কারণে বাংলাদেশকে স্বাক্ষর করতে হবে '৭১-এর নিয়াজির মতো আত্মসমর্পণের দলিলে!

নেপালের ভূমি সার্ভের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, অসদুপায় অবলম্বন করে সীমান্তের পিলারে অদলবদল ঘটিয়ে নেপালেরও ভূমি দখলের চেষ্টা করেছে চীন। এছাড়া চীনের সুবিশাল তিব্বত দখলের ইতিহাস তো নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতের আরেক প্রতিবেশী পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে অবৈধভাবে কাশ্মীরের একাংশ দখল করে রেখে আজও সেখানকার মানুষের উপর মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করছে সরকারি মদতে। সেখানে ১৯৭১ সালে ভারতীয় সৈন্যদের প্রাণের বিনিময়ে, পাকিস্তানকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত করে পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত না করে সেখানকার জনগণের হাতেই তুলে দিয়ে, ৯৩০০০ যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানের হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে ভারত শুধুমাত্র বিশ্বের কাছে নিজের বৃহৎ ও উদার হৃদয়েরই পরিচয় দেয়নি, বরঞ্চ নির্ধারিত সময়ের আগেই অস্তগামী সূর্যকে সাক্ষী রেখে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে এসে প্রমাণ করেছে ভারত তার প্রতিবেশীকে যথাযোগ্য সম্মানও দিতে জানে। তারপর থেকে বাংলাদেশের পাশে সুখে-দুঃখে বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দ্বিধা করেনি ভারত। ভারতের সদিচ্ছায় মীমাংসিত হয়েছে ছিটমহলের মতো জটিল সমস্যাও। এরপরেও বাংলাদেশে 'ভারতীয় আধিপত্যবাদে'র মতো কাল্পনিক শব্দবন্ধের আস্ফালনকে তাদের বৈপ্লবিক মানসিকতার প্রতিফলন নয়, দীর্ঘদিনের লালিত-পালিত বিকৃত, জেহাদি ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকেই প্রকাশ করে।

ফঃ ২

উপকারীর উপকার ভুলে তৌহিদী জনতা গুজব ছড়ায় এই বলে যে পাকিস্তানকে ভেঙে বাংলাদেশ গঠন করা ভারতের নিজ স্বার্থে করা চক্রান্ত। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তার কারণেই নাকি ভারত বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে! এই ভিত্তিহীন কথাবার্তার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য যে বাস্তবতা ঠিক কীরকম? প্রতিবেশী দেশের মানুষের এখন জেহাদিপনা ও মিথ্যাচার ছেড়ে বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। ভারত যদি সত্যিই শত্রুতা চাইতো তাহলে ১৯৭১ সালের অনেক আগে ন্যায্যভাবেই পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারতো। ১৯৬৫ সালে ভারতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর আক্রমণের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে লাহোরে প্রবেশ করে। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ঢাকাকে রক্তরঞ্জিত করতে চাইলে ভারতকে তখন বিশেষ কাঠখড়ও পোড়াতে হতো না। কিন্তু ভারত সেই পথে না গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ সীমিত রাখে। পূর্ব পাকিস্তানও উপলব্ধি করতে পারে যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তান তাদের বাঁচাতে পারবে না।

পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানে যোগদানকারী পূর্ববঙ্গের নেতাদের বিবৃতি পর্যন্ত দিতে হয় এই মর্মে যে 'নয়াদিল্লির সঙ্গে ঢাকার কোনো বিরোধ নেই'। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, ভারত নয়, পূর্ব পাকিস্তানই নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে সন্ত্রস্ত থাকতো। তারপর থেকেই ১৯৫২ সালের পর আবারও শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধিতার একের পর এক ঘটনা। করাচি আর ঢাকা যে একই পথের পথিক নয়, পাকিস্তানের উসকানির যোগ্য জবাব ভারত যেন পূর্ব পাকিস্তানে না দেয়, আকারে ইঙ্গিতে সেই ধরনের নানান অনুরোধের ঘটনার পরিচয়ও পাওয়া যেতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশন হিসেবে গড়ে তুলে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন

> "ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে অবিভক্ত ভারতেও পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে ভারত স্বাধীন করার থেকেও সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মস্থান অপবিত্র করাতে তাদের উৎসাহ বেশি ছিল।"

দেবার দাবির মধ্যে দিয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তার পরিসমাপ্তি হয় ১৯৭১-এ পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ গঠনের দ্বারা। আজ যারা ভারতের চিকেন নেকে আঘাত হানার দিবাস্বপ্ন দেখছে তাদের নিজেদের 'ভালোর' জন্যই পুনরায় ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো উচিত। কথায় বলে, পাগলেও নিজের ভালো বোঝে। সেখানে বাংলাদেশ যদি, যে পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে যুদ্ধের সময়েই শিলিগুড়ি করিডোরের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, উলটে ব্যারাকপুর ও কলাইকুণ্ডায় আক্রমণ করতে এসে নিজেরাই বিপর্যস্ত হয়েছিল— সেই পাকিস্তানের কথায় নেচে পরমাণু শক্তিধর দেশ ভারতের সার্বভৌম ভূখণ্ডের দিকে শকুনের দৃষ্টি দিয়ে নিজেদের কবর নিজেরাই খোঁড়ার কাজ করে তাহলে সেই বাংলাদেশকে বাঁচান কার সাধ্য! তবে বাংলাদেশের মানুষের গুজবে মেতে ওঠা কিন্তু নতুন কিছু নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে হিংসাত্মক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ দৃষ্টিকটু ভাবে পরিলক্ষিত হলেও তাদের এই রোগ বহুদিনের। লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক খোদ এ কে ফজলুল হককে শুধুমাত্র কলকাতায় এসে সংবর্ধনা গ্রহণ করার কারণে শুনতে হয়েছে ভারতের গুপ্তচর হবার কাল্পনিক অভিযোগ। ১৯৫০, ১৯৬৪ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ে ২০২১ সালে দুর্গাপূজার সময়ে গুজব ছড়িয়ে দেশব্যাপী হিন্দু নির্যাতনের মতো ঘটনা বহু বছর ধরেই পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে চলে আসছে। এমনকী ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে অবিভক্ত ভারতেও পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে ভারত স্বাধীন করার থেকেও সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মস্থান অপবিত্র করাতে তাদের উৎসাহ বেশি ছিল। ফলশ্রুতিতে দেশভাগের পর নেহরু-লিয়াকত চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে বাস্তুহারা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ধনেপ্রাণে নাশ করার সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা করে এসেছে ওই মানবেতর জীবেরা। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। সংখ্যালঘু হিন্দু গণহত্যাকারীদের পতনও সময়ের অপেক্ষা।

এতো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হায়েনাদের কালো থাবাকে যতদূর সম্ভব উপেক্ষা করে মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছেন ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক। তিনি এই ব্যাপারে সফলও হয়েছেন অনেকাংশে। কিন্তু আজ সেখানে মোল্লাবাদীদের দাপটে দীর্ঘদিনের চেষ্টায় গড়ে তোলা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুষ্ঠু আলোচনার পথ অবরুদ্ধ। তবে মোল্লাবাদের প্রবল দাপটে অবরুদ্ধ আলোচনার পথ জেহাদিদের জন্য আত্মসমর্পণের পথে পর্যবসিত হতে পারে সেই খেয়াল হয়তো তাদের নেই। সেদিন হয়তো বেশিদূরে নেই যেদিন বাংলাদেশের নিরপরাধ, নিপীড়িত মানুষের চোখের জলেই লিখিত হবে জেহাদি মোল্লাবাদীদের ধ্বংসের উপাখ্যান। যে টেবিলে ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্কের ফলস্বরূপ একাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, আগামীতে সেই টেবিলেই হয়তো নিজেদের ভুলের কারণে বাংলাদেশকে স্বাক্ষর করতে হবে '৭১-এর নিয়াজির মতো আত্মসমর্পণের দলিলে! □

বাংলাদেশে হিন্দুর অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা এবার হুঁশ ফেরাতে হবে সকলকে

চীন ও পাকিস্তান সমর্থিত কট্টরপন্থী, ভারত-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথকে প্রভাবিত করছে। তাদের সাম্প্রতিক তৎপরতা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পাকিস্তানমুখী হয়ে গেছে।

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

২০২৪-এর ৫ জুন বাংলাদেশের হাইকোর্ট চাকরিতে কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল করে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানসন্ততিদের জন্য সিভিল সার্ভিসে ৩০ শতাংশ পদ সংরক্ষণ করে। পরদিন ৬ জুন, কট্টরপন্থী জামায়াত- ই-ইসলামির ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন থানা ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়; ঢাকা, জগন্নাথ, শেরেবাংলা কৃষি, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই ঘটনার সুযোগ নেয় চীন ও পাকিস্তান। কট্টরপন্থী মুসলমানরা বাংলাদেশে ভারতবিরোধী এবং হিন্দুবিরোধী পরিবেশ তৈরি করতে থাকে। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনও ক্রমশ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জেহাদি অভ্যুত্থানে পরিণত হয় এবং তিনি প্রাণে বাঁচার জন্য দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাংলাদেশি সেনার তরফে মাত্র ৪৫ মিনিট সময় পান।

তিনি বাংলাদেশ ছাড়ার পর থেকে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটতে থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই হামলার নিন্দা করে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সব সংখ্যালঘুদের, নারী-পুরুষ-শিশুদের ওপর মোল্লাবাদী হামলা, খুন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অমানবিক নৃশংসতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'

জেহাদি অভ্যুত্থানের পরপরই বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় নোবেলজয়ী ড. মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে। ক্ষমতার শূন্যস্থান দখল করে রাজনৈতিক স্বার্থজড়িত তিনটি গোষ্ঠী। প্রথম হলো বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বা বিএনপি। এরা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী-আধিকারিক এবং প্রভাবশালী ছোটো ব্যবসাদার গোষ্ঠী। দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি হলো জেহাদি জঙ্গি সংগঠন জামায়াত-ই-ইসলামি। তৃতীয়টি বাংলাদেশ তথা সমগ্র উপমহাদেশের কাছে আরও একটি মারাত্মক বিপজ্জনক গোষ্ঠী হলো হিজবুত তাহরির। এটি একটি জেহাদি সংগঠন যাদের মদত দেয় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী। এরা প্রভাবশালী, এরা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই দল বা গোষ্ঠীগুলি গত বছরের আগস্টে বাংলাদেশের প্রশাসনিক যন্ত্রের দখল নেয়। বাংলাদেশকে এরা কট্টর ইসলামি দেশ বানাতে

চায়, চরমপন্থী শরিয়তি আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

প্রধান উপদেষ্টা ইউনুসের অধীনে বাংলাদেশের 'অন্তর্বর্তী সরকার', মানবাধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু তৃণমূল স্তরের বাস্তবতা হলো ইউনুস প্রশাসনিক প্রধান হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের মানুষ দেখছে সব ধরনের অধিকার লঙ্ঘন, মব লিঞ্চিং এবং সংখ্যালঘু মহিলাদের উপর ব্যাপক নির্যাতন ও হিংসা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, আইনজীবী, এমনকী বিচারকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে এই প্রশাসন বাংলাদেশ জুড়ে ভয় এবং ভীতির এক বিষাক্ত আবহ তৈরি করেছে।

প্রাক্তন আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি-সহ দুই ডজনেরও বেশি প্রাক্তন মন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছে। ইসকনের সন্ন্যাসীদের উপরও হামলা হয়েছে। মুসলমানরা সংখ্যালঘু ধর্মীয় নেতাদের টার্গেট করছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাদের বিবৃতিতে বলেছে, 'ইসকনের সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস হিন্দুদের শান্তিপূর্ণভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন; বাংলাদেশ সরকারের তরফে তাঁকে কারাগারে পাঠানো অন্যায়'। ইসকনের সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থাগ্রহণের পিছনে কিন্তু আসলে হিন্দুসমাজই লক্ষ্য।

অবৈধ অন্তর্বর্তী সরকারের ভণ্ডামি প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশে অফিস খুলতে চাওয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার পরস্পর-বিরোধী বিবৃতি দেয়। সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা বলে, অফিস খোলার কাজ চলছে। অথচ পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলে, এইরকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এই অনিশ্চয়তা অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরের গভীরতর উদ্বেগজনক বিষয় প্রতিফলিত করে। সরকার হিন্দুদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, হত্যা ও নিপীড়ন করছে। মোল্লাবাদী দলগুলো রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার অফিস প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে এই যুক্তিতে যে এটা বাংলাদেশের ইসলামি রীতি ও মজহবি নীতির পক্ষে একটি বিপদ যার মাধ্যমে সমকামিতা প্রচারিত হতে পারে। এই গোষ্ঠীগুলোর উত্থান শুধু বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতিকেই ধ্বংস করছে তাই নয়, তারা বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্যও বড়ো বিপদস্বরূপ।

বাংলাদেশে দিন দিন উগ্রবাদ ও উগ্রবাদীদের প্রভাব বাড়ছে। জেহাদি অভ্যুত্থানের পর, অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪-এর ২৬ আগস্ট আল-কায়েদার অনুসারী জঙ্গিগোষ্ঠী আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধান মুফতি জসিমউদ্দিনকে মুক্তি দেয়। হাসিনার দেশত্যাগের পর থেকে হিন্দুদের ওপর নিরন্তর হামলা চলছে, হাজার হাজার অস্ত্র লুট করেছে ইসলামি জঙ্গিরা, তারা হিন্দুদের বাড়িঘর টার্গেট করেছে। সোশ্যাল মিডিয়াকে শক্তিশালী হাতিয়ার করেছে বাংলাদেশের কট্টরপন্থী জেহদিরা যাতে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে তারা সহজে পৌঁছতে পারে এবং বাংলাদেশি সমাজকে পুরোপুরি প্রভাবিত করতে পারে। ইউটিউব এবং ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি বিষাক্ত মোল্লাবাদী চিন্তাধারা প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিশিষ্ট ইসলামি উগ্রপন্থী আনায়েতুল্লাহ আব্বাসি, শেখ আহমদুল্লা হাফি, মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা মাহামুদুল হাসান এবং মওলানা সাদিকুর রহমান আজহারি এই দায়িত্বে আছেন।

এই কট্টর মোল্লাবাদীরা নানা গল্প বানায় এবং মজহবি উপদেশ ও আলোচনা সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে যাতে ইসলামের রক্ষণশীল, চরমপন্থী ব্যাখ্যায় জোর দেওয়া হয়, বাংলাদেশ ও তার বাইরেও মুসলমানদের যা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়াও, জাহিদ-উর-রহমান, পিনাকী ভট্টাচার্য (ছুপা ধর্মান্তরিত মুসলমান) গোলাম মওলা রনি, ইলিয়াস হোসেন, তাজ-উল-হাশমি, জ্যাকব মিল্টন, জুলকারনাইন সাকিব, আবদুর রব ভুট্টো, কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান এবং কনক সারোয়ারের মতো সামাজিক মাধ্যমে প্রভাবশালীরা এই প্ল্যাটফর্মগুলোকে শেখ হাসিনা এবং তার উদারনীতির বিরুদ্ধে আখ্যান প্রচারের কাজে ব্যবহার করছেন।

মজহবি ভাষণ, ধর্মনিরপেক্ষতার সমালোচনা এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কাঠামোর বিরোধিতা করে পাক-সমর্থিত এই গল্পকাররা চীনের টাকায় একটি শক্তিশালী ভার্চুয়াল ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে যা উগ্র জেহাদি দৃষ্টিভঙ্গিকে উসকানি দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের প্রতি অবিশ্বাস বাড়াতে এবং ইসলামি দেশের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের লক্ষ্যে চলে তাদের ন্যারেটিভ নির্মাণ।

সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, মন্দির, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও সম্পত্তি ব্যাপকভাবে ভাঙচুর ও ধ্বংস করা হয়েছে। ২০২৪-এর ২০ আগস্ট বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত দৈনিক প্রথম আলো জানিয়েছে যে, ৫-১৪ আগস্ট পর্যন্ত মোট ১৪৯২টি ভাস্কর্য, সিরামিক ভাস্কর্য, টেরাকোটা, ম্যুরাল এবং স্মারক পুড়িয়ে, উপড়ে ফেলে এবং বিকৃত করে ধ্বংস করা হয়েছে। এটা ছড়িয়ে পড়েছে ৫৯টা জেলায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে গত বছরের ৫, ৬ ও ৭ আগস্ট। ঢাকায় ১২২-টিরও বেশি ভাস্কর্য গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ১৫টি ম্যুরাল ধ্বংস করা হয়েছে, যার মধ্যে সাতটি মুজিবুর রহমানের পূর্ণাবয়ব মূর্তি।

ঢাকায় ২৭৩, চট্টগ্রামে ২০৪, রাজশাহীতে ১৬৬, খুলনায় ৪৭৯, বরিশালে ১০০টি, রংপুরে ১২৯, সিলেটে ৪৯, ময়মনসিংহে ৯২টি এইরকম ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশ জুড়ে উগ্র জেহাদি মোল্লাবাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের বিষয়টি প্রকাশ করে, এরা পূর্ববঙ্গের হিন্দু সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতির ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

উগ্র জেহাদি ইসলামের উত্থান ভয়ংকর মাত্রায় হিন্দুদের নিপীড়নের শিকার করেছে। ১৯৪৭ পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশে থেকে যাওয়া প্রান্তিক হিন্দুরা এই জেহাদি নির্যাতনের শিকার। হিন্দুদের জন্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পূর্ণ প্রতিকূল হয়ে উঠছে।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় যে, হাজার হাজার হিন্দু শিক্ষক ও অধ্যাপককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে অথবা চাপের মুখে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে। হাজার হাজার হিন্দু যুক্ত ছিলেন শিক্ষা, কৃষি এবং ছোটো ব্যবসায়ে। তাঁদের বাধ্য করা হয়েছে পেশা ছাড়তে। মোল্লাবাদী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করার বৃহত্তর প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয় এই ঘটনাগুলির মাধ্যমে। হিন্দু-নিপীড়নের হার বেড়েছে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর। হিন্দুসমাজ নানাভাবে হিংসার সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে আছে জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ, নারী অপহরণ এবং মন্দিরে হামলা। এই হামলার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাদের বিবৃতিতে বলেছে, 'অগণতান্ত্রিক উপায়ে হিন্দুদের প্রতিবাদকে দমন করতে

হিন্দুদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও নৃশংসতার নতুন পর্ব শুরু হয়েছে বাংলাদেশে'।

দেখা যায় যে ৫০ শতাংশের বেশি হিংসার ঘটনা ঘটেছে দুর্গা পূজার সময়। হিন্দু মন্দিরগুলিতে উৎসব উদ্‌যাপন বন্ধ করতে আক্রমণ চালায় জেহাদিরা। সশস্ত্র মুসলমান জনতা কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, নোয়াখালী, খুলনা, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া-সহ সারা বাংলাদেশে শত শত হিন্দু মন্দির, আক্রমণ করে। বাবুল চ্যাটার্জি, মৃণাল চ্যাটার্জি, কাজল রায়, সুমন ঘড়ার মতো অনেক হিন্দু, উগ্র ইসলামপন্থী জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে খুন হয়েছেন।

এসব উগ্রপন্থীর প্রতি সরকারের নিষ্ক্রিয়তাই বাংলাদেশের বর্তমান নেতাদের এদের সঙ্গে জড়িত থাকার ছবি তুলে ধরে। নেতারা পরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের টার্গেট করে তাদের খতম করতে উদ্যত হয়েছে, যার ফল হলো অসংখ্য হিন্দু নেতা ও সাংবাদিকদের গ্রেপ্তারি। এমনকী বহু হিন্দুর হত্যাকাণ্ডে পুলিশ জড়িত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করেছে--- বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিলম্বে থামান এবং প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে মুক্তি দিন।

চীন ও পাকিস্তান সমর্থিত কট্টরপন্থী, ভারত-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথকে প্রভাবিত করছে। তাদের সাম্প্রতিক তৎপরতা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পাকিস্তানমুখী হয়ে গেছে।

২০২৪-এর ১১ নভেম্বর পাকিস্তান থেকে সরাসরি কার্গো জাহাজ এসেছিল চট্টগ্রামে, ১৯৭১ সালের পর এই প্রথমবার। এটা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত। ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ দৈনিক সাতক্ষীরার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির নেতা গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে একটি জামাতি প্রতিনিধিদল ঢাকায় পাকিস্তানের হাইকমিশনার অফিসে দেখা করেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক-পুনর্গঠন এবং বাংলাদেশে মোল্লাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভাবিত করার জন্য পাকিস্তানের প্রচেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয়। ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ঢাকা ট্রিবিউন রিপোর্ট করেছে যে পাক হাই কমিশনার বাংলাদেশের প্রশাসনিক নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং

মৌলভি-হুজুরদের ভারত-বিদ্বেষী বিষাক্ত ভাষণের কারণে ভারত-বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা দুই দেশের পক্ষেই গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাকিস্তানি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে ব্যবসার সুযোগ সন্ধানে উৎসাহিত করেন।

স্কুলে উর্দু শিক্ষা এবং পারমাণবিক অস্ত্র ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার সম্ভাবনা নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তিটি হলো বাংলাদেশে পাকিস্তানি প্রভাব বৃদ্ধির আরেকটি ইঙ্গিত। ভারতের জন্য এটা অশুভ, কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। কয়েক দশক ধরে ভারত-পাক সীমান্তে পাকিস্তানের মোল্লাবাদীদের দৌরাত্ম্য নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র নীতির পরিবর্তনের বিষয়টি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের দিশা সম্পর্কে একটি অশুভ সংকেত।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো ভারত-বিরোধী আখ্যান ছড়িয়ে পাকিস্তানি মোল্লাবাদী গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা এই সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করে হয়ে চলেছে। পাকিস্তানপন্থী ভাষণ এখন বাংলাদেশে বিশেষ মর্যাদা পাচ্ছে। হিজবুত তাহরির পাকিস্তানি সেনা ও জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির সাহায্যে, ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে অশান্তি ছড়ানোর জন্য জেহাদিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

বর্তমান ভারত ক্রমশ বিশ্বনেতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে সঞ্চারিত হচ্ছে ভারতের প্রভাব। ভারত-বিরোধী শক্তিগুলো এতে ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে প্রক্সি যুদ্ধ চালু করেছে। গত নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিএনপি 'ভারত বয়কট' অভিযান শুরু করেছে। তাদের পাকিস্তান ও চীনমুখী অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা কাজে লাগায় বাংলাদেশে ৩০ শতাংশ কোটা আন্দোলনকে। এই আন্দোলনের অজুহাতে তারা ভারত-বিরোধী এবং হিন্দু-বিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু করে।

যারা ভারতকে ভাগ করতে চায় সেই বাম-উদারপন্থী দল (লেফট্-লিবারাল) এবং সেকুলারিজমের স্বঘোষিত ধ্বজাধারীরা এই জেহাদি অভ্যুত্থানকে ছাত্র আন্দোলন হিসেবে দেখাচ্ছে। তারা আবার এই জেহাদিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী মোল্লাবাদী সরকারও চীন, পাকিস্তান এবং ইসলামিক জেহাদিদের দ্বারা সমর্থিত যারা উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। বাংলাদেশ দ্রুত 'চিকেনস্ নেক'-এ আক্রমণের লঞ্চিং প্যাড হয়ে উঠছে।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রশিক্ষণ-সহ যেসব দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চলছে, এটা ভারতের জাতীয় অখণ্ডতার ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে আশঙ্কাস্বরূপ। ১৯৭০ থেকে বাংলাদেশে পাকিস্তানপন্থী লবি সক্রিয় ছিল। তারাই আজ ভারতীয় পতাকা মাড়িয়ে চলেছে। এটা বিপজ্জনক।

পরিশেষে বলা যায় পাকিস্তান ও চীন-সমর্থিত কট্টর ইসলামপন্থী জামাত-হিজবুত তাহরির শক্তির দ্বারা হিন্দুদের উপর নৃশংস হামলার ঘটনা বাংলাদেশ জুড়ে ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশ বর্তমানে একটি জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সমালোচকরা ক্রমাগত দমন-পীড়নের সম্মুখীন হচ্ছে। সামরিক বাহিনী এবং জেহাদি জোট আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও ধর্মনিরপেক্ষ বিচারধারার বিরুদ্ধে কাজ করছে। হিন্দুদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো, মৌলভি-হুজুরদের ভারত-বিদ্বেষী বিষাক্ত ভাষণের কারণে ভারত-বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা দুই দেশের পক্ষেই গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এতে অবাক হচ্ছেন না, কারণ এটাই ১৪০০ বছরের ইসলামের ইতিহাস। জেহাদ অনেক হয়েছে, এবার ঘরে ফেরার ডাক দিতে হবে। □

বর্তমান বাজেট 'বিকশিত ভারত গঠনের' মাধ্যমে ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে পৌঁছে দেওয়ার একটা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সেই সঙ্গে স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলিকে অর্জন করার একটা সুপ্রচেষ্টা।

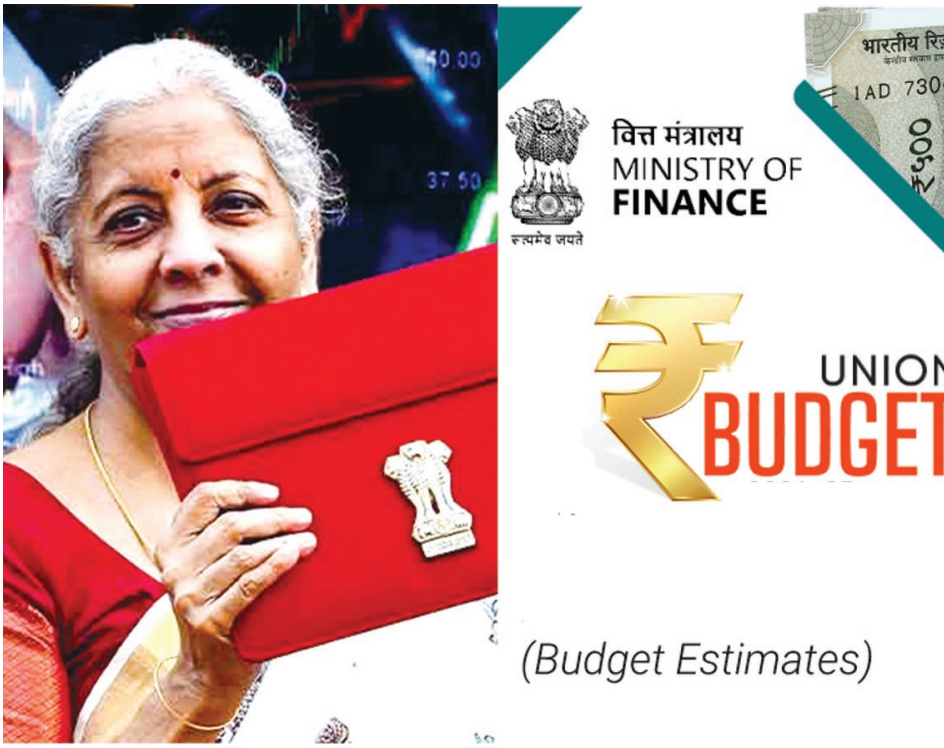

২০২৫-'২৬-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে পণ্য-পরিষেবার মূল্য ও কর কাঠামোর বিশ্লেষণ

ড. রতন কুমার ঘোষাল

আমরা মোটামুটি ভাবে সকলেই প্রায় জানি গত ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ সংসদে যথাক্রমে ২০২৫-'২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বাজেট পেশ করেছেন। স্বভাবতই তারপর থেকেই রাস্তাঘাটে, ট্রেনে, বাসে এমনকী চায়ের দোকানের আড্ডায় একই আলোচনার ঝড়— আমাদের কী লাভ হবে? কেউ কিন্তু দেশের কথা ভেবে বা বাজেট অর্থনীতির কথা ভেবে বলছেন না। আলোচনার মূল লক্ষ্যই হলো জিনিসপত্র, পরিষেবার দাম, চাকুরিজীবী হলে কর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সমালোচনা চার ধরনের হতে পারে। এক, সমালোচনার জন্য সমালোচনা অর্থাৎ এটা বহু মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়; দুই, সমালোচনা (Destructive) অগঠনমূলক ; তিন, সমালোচনা (Constructive) গঠন বা সংশোধনমূলক এবং চার, ঈর্ষামূলক সমালোচনা। প্রথম দুটি ও শেষটির প্রাধান্য ভারতে সমবচেয়ে বেশি দেখা যায় এবং বর্তমানে প্রত্যেক বছর বাজেটের পরপর তাই হতে দেখা যায়। কেউ-বা কাগজে লেখেন নিজের অস্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য, তার মধ্যে যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ থাক বা না থাক।

অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে যতটুকু অর্থনীতি আমি শিখতে পেরেছি তার ভিত্তিতেই বর্তমান বাজেটের বিভিন্ন পণ্য পরিষেবার মূল্য ও কর কাঠামোর প্রস্তাব নিয়ে দু'চার কথা আলোচনা করছি। একথা আমরা সকলেই বোধহয় জানি যে কোনো বছরের বাজেট হলো সরকারের ওই বছরে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটা খসড়া হিসেব পেশ। স্বভাবতই মনে রাখতে হবে, এই বাজেটের বা বাজেট তৈরির পেছনে অর্থনীতির কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব কাজ করে। অন্যদিকে যে কোনো বছরের বাজেট তৈরির আগে গত আর্থিক বছরের (এক্ষেত্রে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের) অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রের একটা সামগ্রিক সমীক্ষা করতে হয় এবং এর ভিত্তিতেই বর্তমান বাজেট তৈরি করতে হয়। এখান থেকেই কোন ক্ষেত্রে কত ব্যয় বাড়াতে হবে বা কমাতে হবে; কোন ক্ষেত্র থেকে কত আয় করতে হবে তা স্থির করে বাজেট তৈরি করা হয়। তবে এসবগুলিই একটা মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে করা হয়। এছাড়া যেহেতু আমরা বিশ্বায়নের যুগে বাস করছি, আমাদের দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক সূচকগুলি যেমন, বিনিয়োগ, সঞ্চয়, সুদের হার, দ্রব্য ও সেবার দেশের মোট চাহিদা, জোগান ও দাম প্রভৃতি সমস্তগুলিই বিশ্বের অর্থনৈতিক সূচকগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই সমালোচনা-

আলোচনা যাই করি না কেন, এই সমস্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখে করাই শ্রেয়।

বর্তমান বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো 'বিকশিত ভারত' গঠনের মাধ্যমে ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে পৌঁছে দেওয়া, যাতে স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির (Sustainable Development Goals) অন্তর্গত সমস্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলিই অর্জন করা (যেমন দেশকে দরিদ্র শূন্য করা যায় ; চরম অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া পরিবেশ দূষণের মাত্রাকে সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। বর্তমান সরকারের কার্যকালেই নিতান্ত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বেকারত্বের হারও চমকপ্রদ ভাবে ক্রমাগত কমে (কোভিড বছরগুলি বাদে) ২০২৪-এর জুলাই মাসে ৩.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

এবার আসা যাক পণ্য ও পরিষেবার মূল্য বিশ্লেষণে। এক্ষেত্রে এটুকু বলা প্রয়োজন যে নির্মলা সীতারামণ এই বাজেটেও অর্থনীতিবিদ কেইন্সের চাহিদা ব্যবস্থাপনার নীতিকেই অনুসরণ করেছেন। অর্থমন্ত্রী দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতির (অর্থাৎ দেশের মোট পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদনের মোট অর্থ মূল্য বৃদ্ধির) হার ২০২৫ অর্থবর্ষে ধরেছেন ৬.৪ শতাংশ ও ২০২৬ অর্থবর্ষে তা ৬.৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬.৮ শতাংশ ধরেছেন।

দেশের মোট পণ্য-পরিষেবা উৎপাদনের বর্তমান অর্থমূল্যের দুটি দিক আছে। একটা মোট চাহিদার দিক (যা হলো দেশি ও বিদেশীয় চাহিদার যোগফল)। যেখানে দেশীয় মোট চাহিদা হলো দেশের মধ্যে মোট পণ্য-পরিষেবার চাহিদা বা দেশীয় জনগণের চাহিদা এবং আমাদের দেশে উৎপাদিত দ্রব্য-সেবার জন্য বিদেশের চাহিদার (অর্থাৎ রপ্তানির) সৃষ্টি। অন্যদিকে আমাদের দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার মোট জোগান হলো দেশের মধ্যে উৎপাদিত মোট পণ্য-পরিষেবা এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা মোট পণ্য-পরিষেবার সমষ্টি। বিশ্বায়নের যুগে এই ব্যবস্থা অবাধ। স্বভাবতই দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাকাজের দামের উপর রপ্তানি (বিদেশের চাহিদা) ও আমদানির (বিদেশ থেকে জোগান) এদের প্রভাব থাকবেই। দামস্তর বিশ্লেষণে এটা মাথায় রাখতে হবে।

অন্যদিকে দ্রব্য ও সেবাকাজের দামস্তর নির্ধারণে দ্রব্যের মোট চাহিদা ও জোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের একটা ভূমিকা থাকে। দ্রব্য ও সেবাকাজের দামস্তর বাড়বে (অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়বে) বা কমবে তার পিছনে দুটি শক্তি/ধাক্কা (বা চাহিদা তাড়িত) অর্থাৎ দ্রব্য ও সেবার জোগান অপেক্ষা (দাম, দ্রব্যের জোগানও অন্যায় বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থেকে) চাহিদা বেড়ে যাওয়া। এর মানে দ্রব্য ও সেবার অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হওয়া। ফলত, দ্রব্য ও সেবা কাজের দামস্তর বাড়তে থাকবে। এটাকে চাহিদা তাড়িত মুদ্রাস্ফীতি বলে। অন্যদিকে জোগানের দিক থেকে ধাক্কা (যা চাহিদা অপরিবর্তিত থেকে জোগান কমে গেলে) হলে অতিরিক্ত বা মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়বে। এটা হলো জোগান-তাড়িত মুদ্রাস্ফীতি। আর একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে মুদ্রাস্ফীতির বা দেশের মোট দ্রব্য সেবার দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণত বেকারত্বের হারের বিপরীত সম্পর্ক আছে। আসলে কোনো সরকারই ইচ্ছাকৃতভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে পারে না বা বাড়ায় না। কারণ তাতে দেশের সমস্ত মানুষের দল মত নির্বিশেষে ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবে। অধিকন্তু এর সঙ্গে আবার কর কাঠামোর পরিবর্তনেরও সম্পর্ক আছে। যেমন আয়করের হার বেড়ে বা কমে গেলে মানুষের হস্তান্তরযোগ্য আয় বা ক্রয় ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এবং এটা একটা জ্যামিতিক প্রগতির মতো গুণক পদ্ধতিতে ঘটতে থাকে।

ফলত, দেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক সূচকগুলি যথা প্রকৃত সুদের হার তথা প্রাইভেট বা কর্পোরেট বিনিয়োগের (দেশি ও বিদেশি) হার ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার প্রভৃতি সবকিছুই প্রভাবিত হয়। তাই দেশের মোট আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং বাজেট তৈরির সময় এই সমস্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখেই করতে হয়। অর্থমন্ত্রী বর্তমান বাজেটে ও আগের বাজেটগুলিতেও অনেকটাই সেই রকম করেছেন। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ (আমি আগেও লিখেছি) হলো তার Fiscal Consolidation-এর দক্ষতা অর্থাৎ আর্থিক পূর্ণবিন্যস্তকরণের দক্ষতা।

এখন এ বছরের বাজেটেও খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হারকে ৪.১ শতাংশে নির্দিষ্ট করে রাখার প্রস্তাব আছে। আগের বছরে খুচরা মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৪.৯ শতাংশ। তবে শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্যের দামের সূচককে ধরলে দেখা যায় (অর্থনৈতিক সমীক্ষাতে) তা আগের বছর ছিল ৭.৫ শতাংশ এবং বর্তমান বছরে এটা বেড়ে ৮.৪ শতাংশ হতে পারে এটা হতে পারে শুধুমাত্র ডাল ও সবজি জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু কেন? তার প্রধান কারণ দেশে কৃষির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব (অর্থাৎ ঝড়, ঝঞ্ঝা, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা প্রভৃতি কারণে) —যা আমরা সকলেই দেখছি। কারণ প্রকৃতির উপর কোনো সরকারেরই শুধু নয়, কোনো মানুষেরই নিয়ন্ত্রণ নেই।

আর একটি বাহ্যিক কারণ রয়েছে। তা

হলো— যখনই আমরা মূল মুদ্রাস্ফীতির হার ধরি তখন তার মধ্যে থাকে তেল ও তেলজাত দ্রব্য, ওষুধ প্রভৃতি থাকে। আর এটা আমরা সকলেই সম্ভবত জানি যে ভারতবর্ষের প্রধান আমদানিকৃত দ্রব্য হলো খনিজ তেল যার দাম দেশের সরকারের উপর নির্ভর করে না। এটা নির্ভর করে যে দেশগুলি থেকে তেল আমদানি করা হচ্ছে তাদের উপর এবং প্রকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হারের উপর।

অন্যদিকে, আবার কৃষিজাত দ্রব্যের সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের দামের সম্পর্ক আছে। কারণ কৃষিতে প্রয়োজনীয় সার, কীটনাশক ওষুধ, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্পে তৈরি হয়। অন্যদিকে শিল্পে প্রয়োজনীয় অনেক কাঁচামাল কৃষিতে তৈরি হয়। সুতরাং শিল্প হতে জাত এবং কৃষিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়লে কৃষিজাত দ্রব্যেরও দাম বাড়বে। পক্ষান্তরে উলটোটাও হবে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধিতে এদেরও অবদান আছে। আবার মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়লে কৃষি ও শিল্প শ্রমিকের মজুরির হার বাড়বে। তাই জিনিসপত্রের দামও বাড়বে। আবার এর উলটোটাও হবে।

এগুলি যাতে না হয় অর্থাৎ দ্রব্যের দামস্তর যাতে না বাড়ে তার জন্য এই বাজেটেও অর্থমন্ত্রী কৃষির ওপর গুরুত্ব দিয়ে দেশের ১০০টি জেলার ১.৭ কোটি কৃষককে 'প্রধানমন্ত্রী ধন্যধান্য কৃষি যোজনার' আওতায় আনার অঙ্গীকার করেছেন, কৃষকের জন্য স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বৃদ্ধির প্রস্তাব রেখেছেন। অন্যদিকে আমদানি শুল্ক হ্রাস করেছেন, কর্পোরেট ট্যাক্স ১০.৫ শতাংশ থেকে সামান্য বাড়িয়ে ১১ শতাংশ করেছেন। জীবনদায়ী ওষুধের আমদানি শুল্ক কমিয়ে দাম কমাবার কথা ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে আবার চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন সড়ক পরিবহণ, রেল, যোগাযোগ, পরমাণু শক্তি, তেল প্রভৃতি ক্ষেত্রে মূলধনী ব্যয় (Capital Expenditure) অনেক বাড়িয়েছেন। অথচ সরকারি ঋণ খুব বেশি বাড়াননি এবং ফিসক্যাল ঘাটতি ৪.৮ শতাংশে রেখেছেন। যা সত্যই প্রশংসনীয়।

অন্যদিকে আমরা জানি যে আর্থিক পূর্ণবিন্যস্তকরণের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো 'কর কাঠামোতে পরিবর্তন আনা'। সেখানে অর্থমন্ত্রী যে একটা চমকপ্রদ ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছেন তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। যেমন ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের মাত্রা বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করেছেন এবং ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করশূন্য করেছেন। অর্থাৎ ১২.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় করশূন্য। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সুদের থেকে করযোগ্য আয়ের মাত্রা ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করেছেন। অন্যদিকে আয়কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল করেছেন। অর্থাৎ বেশি আয়ের লোকেদের বেশি কর দিতে হবে। এটা সামাজিক ন্যায়বিচার সূচিত করে। কর্পোরেট করও খুব বেশি বাড়াননি। এক কথায় কর কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য আয় তথা চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতির হারকে ধরে রাখার যে চেষ্টা করেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে বর্তমান বাজেট 'বিকশিত ভারত গঠনের' মাধ্যমে ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে পৌঁছে দেওয়ার একটা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সেই সঙ্গে স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাগুলিকে অর্জন করার একটা সুপ্রচেষ্টা। আশা করা যায় এই বাজেটে দেশের সর্বস্তরের মানুষই উপকৃত হবেন।

(লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পূর্বতন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

সরস্বতী পূজা এপার ও ওপারে

প্রতিবছর বিভিন্ন পূজার আগে আগে সীমান্তের ওপার থেকে পূজাতে ফতোয়া জারি ছাড়াও মূর্তি ভাঙা, মণ্ডপে ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনার কথা শুনে আসতে হচ্ছে। প্রচণ্ড বিরোধিতা উপেক্ষা করে পূজা হতে দেখেছি। আসলে ওপারে যারা বাধা দিচ্ছে সেই আরবী দস্যুদের ধারক বাহকেরা এপারেও রয়েছে আর বিশেষ ছত্রছায়াতেই রয়েছে। তাই তারা স্বভাব উপেক্ষা করে কীভাবে? হাজার হলেও স্বভাব তো বদলানো যায় না।

যোগেশচন্দ্র ল' কলেজে বা জেলার বেশ কিছু বিদ্যালয়ে ফতোয়া জারি করে, কোথাও আবার বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে, কোথাও মূর্তি ভেঙে তারা প্রমাণ দিল তারা এখনও তেমনই আছে। নালন্দা জ্বালিয়ে যারা আনন্দ পেয়েছিল, তাদের বিদ্যা যে কিছুমাত্র নেই তার প্রমাণ তারা বহু দিয়েছে। যারা বিদ্যার আরাধনা করে তাদের শত্রু বলেই মনে করে তারা। তাই তো নিত্য সরস্বতী আরাধনাকারী বিজ্ঞানী ড. এপিজে আব্দুল কালামকে তারা ব্রাত্য করে দিয়েছে। যে সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞ শিব, রাম, কৃষ্ণ বা গণেশ বন্দনাকারী, পদবিতে খান, হুসেন হলেও তারা তাদের শত্রু। ভারতের হয়ে কথা বললে বা ভারতের জন্য কাজ করলেও শত্রু। ভারতে সরস্বতী পূজা হবে না তো কোথায় হবে? যারা বাধা দেবে বা বাধাদানকারীর সমর্থনকারী সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতির শত্রু।

—নিশীথ রায়,
চাকদহ, নদীয়া।

বাংলাদেশি জেহাদিরা জানে কে তাদের আসল বন্ধু

১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর নাগরিক প্রায় ভুলতে বসেছিল তাদের আসল বন্ধু কে। এতদিনে তারা সেটা বুঝতে পেরেছে। যারা আটার বস্তা নিয়ে, কখনো টমেটো নিয়ে, কখনো পানীয় জলের জন্য লাইন দেয়, ভিক্ষা করে, প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি করে। হ্যাঁ, তারাই এদের প্রকৃত বন্ধু। যারা বঙ্গই মানে না, তাদের আবার বঙ্গবন্ধু কীসের?

তাই প্রকৃত বন্ধুদের পরামর্শ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িঘর সব লুঠ করা হলো, তারপর ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হলো। তবে এটাকে লুঠ বলাটাও কমই হবে। চেয়ার, টেবিল, মগ, বালতি, হাতা, চামচ, ইটের টুকরো কিছুই ছাড়েনি। সেই দৃশ্য দেখে কেউ কেউ চোখের জলে নাকের জলে এক করলো। দুঃখ করে লাভ নাই। যার বাড়ি সে ছাত্রনেতা থাকাকালীন কলকাতার হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল, তার কী কিছুই শাস্তি হবে না নাকি? তাদের হাতেই সব ধ্বংস হলো এবং হচ্ছে। ইতিহাস যে এইভাবে সময়ের চাকা ঘুরিয়ে দেবে তা হয়তো কেউ বুঝতে পারেনি। অনেকেই সেদিন ভারত থেকে আলাদা অস্তিত্বের আনন্দে আহ্লাদিত হয়েছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি গান বেঁধেছিল। ভুল ভাঙছে, আরও ভাঙবে। তারা তাদের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে পাকিস্তানেরই হাত ধরেছে।

—মহাদেব সরকার,
খাগড়াঘাট, মুর্শিদাবাদ।

মতুয়া ধাম

শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের আশীর্বাদকে মাথায় নিয়ে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বেশিরভাগ মানুষ শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরম ভক্ত। ঠাকুরনগরের বিখ্যাত বারুণী স্নান ও বারুণী মেলা ঠাকুরনগরে শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর মন্দির এবং শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর মন্দিরকে সামনে রেখেই অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুরনগর স্টেশন এবং ঠাকুরনগর নামকরণ হয়েছে আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় দেবতা শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম অনুসারেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এখনো পর্যন্ত ঠাকুরনগর নামে কোনো বিধানসভা কেন্দ্র নেই। বনগাঁ লোকসভার অভ্যন্তরে ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত। সময় এবং কালকে উত্তীর্ণ করে, শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর এবং শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর এখন সকল মানুষেরই প্রাণপ্রিয় আরাধ্য পুরুষ।

রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের কাছে বিনম্র চিত্তে আবেদন, অতি দ্রুত বনগাঁ লোকসভা আসনের নাম পরিবর্তন করে মতুয়া ধাম লোকসভা কেন্দ্র অথবা ঠাকুরনগর লোকসভা কেন্দ্র হিসেবে যাতে আত্মপ্রকাশ করে তার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন। আশা রাখি রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ এবং আন্তরিক সহযোগিতাতে বনগাঁ লোকসভা আসন নাম পরিবর্তিত হয়ে মতুয়া ধাম লোকসভা আসন অথবা ঠাকুরনগর লোকসভা আসন হিসেবে আগামী নির্বাচনের আগেই ঘোষিত হবে।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজ রোড, খয়রামারি, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

পশ্চিমবঙ্গে কি তালিবানি শাসন চলছে?

বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী। তিনি কোনো জাতি, সম্প্রদায় বা উপাসনা পদ্ধতির নন। তিনি দেশকালের ঊর্ধ্বে শুধুমাত্র বিদ্যার দেবী। শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতিরও তিনি বিদ্যার দেবী। জ্ঞানার্জনের যে কোনো শাখার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি পূজিত হন। বর্বর ইসলামি দস্যুরা ভারতবর্ষে মঠ, মন্দির-সহ বিখ্যাত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ফেলে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অন্যতম শক্তিপীঠ তথা শিক্ষাকেন্দ্র সারদাপীঠ আজ তাদের আক্রমণে ধ্বংসস্তূপ। ভোজশালায় বিখ্যাত

শিক্ষাকেন্দ্র তথা সরস্বতী মন্দির আজ মসজিদে পরিণত। ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলির মুসলমান তোষণে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও তা উদ্ধার হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের দুর্ভাগ্য, শাসকদলের ফতোয়ায় দুর্গাপূজার বিসর্জন নির্ধারিত সময়ে করা যায় না। আদালতের অনুমতি নিয়ে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে হয়। এক কথায় পশ্চিমবঙ্গে তালিবানি শাসন চলছে। এবারে সরস্বতী পূজায় তা প্রকট আকার ধারণ করেছে। কলকাতার একটি কলেজে সরস্বতীপূজা বন্ধের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে সেখানে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় পূজা করতে হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শাসকদলের দুধেল গাইদের হুমকিতে পূজা করা যায়নি। কিন্তু এ রাজ্যের মানুষের বোধোদয় কবে হবে? তিন-তিনবার ভোটে জিতিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে একজন তালিবানি মানসিকতার মহিলাকে। হিন্দুরা আর কতদিন ঘুমিয়ে থাকবে?

—সুশোভন দাস,
বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯।

ভোট বাক্সে প্রতিবাদ করুন

বেশি প্রতিবাদ, চিৎকার, চেঁচামেচি করবেন না, কারণ প্রতিবাদ করার অধিকার আপনারা হারিয়েছেন সেদিন, যেদিন কামদুনির কলেজ-ছাত্রীকে শাসকের মদতপুষ্ট নরপিশাচরা ধর্ষণ করে নৃশংস খুন করেছিল। তার সুবিচার হয়নি। নেতা, মন্ত্রীরা সারদা, নারদার মতো আর্থিক কেলেঙ্কারি করা সত্ত্বেও আপনারা কিন্তু তাদেরকেই নির্বাচিত করেছেন। একশো দিনের কাজের টাকা চুরি, চাকরি চুরি, শিক্ষা চুরি, সবকিছুতেই কাটমানি, তা সত্ত্বেও আপনারা তাদের নির্বাচিত করেছেন। তাই চিৎকার করে লাভ নেই। যে সব খাবার, ওষুধ খাচ্ছেন সেগুলোতেও ভেজাল আর এই ভেজাল ও জাল স্যালাইন দিয়ে মৃত্যু হলেও আপনারা চিৎকার করবেন না। কারণ আপনারা এইসব কিছু করার অধিকার ওদেরই দিয়েছেন। বাড়ির পাশের যুবক তরতাজা ছেলেটা দেশি চুল্লু খেয়ে অকালে চলে গেলেও বেশি চিৎকার করবেন না, কারণ আপনার স্ত্রী ১০০০ টাকা ওই মদ বিক্রির ট্যাক্স থেকে ভাগ পাচ্ছেন। চোখের সামনে গরিব মানুষের ছেলের মিড ডে মিলের চাল, টাকা চুরি হলেও চিৎকার করবেন না, কারণ আপনার বাড়ির ছেলেটা তো বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা করে। তবে ফুটো হওয়া জাহাজের যাত্রী হয়েও নিজেকে ও নিজের পরিবারকে খুব বেশি নিরাপদ ভাববেন না কারণ সময়ের চাকার সঙ্গে এইসব ঘুরছে। পালা আপনার ও আসতে পারে। তখনও আপনারা চিৎকার, প্রতিবাদ করবেন না। আপনার ধর্ম, অস্তিত্ব সংকট হলে, বাড়ির শিক্ষিত ছেলেটা বেকারত্বের জ্বালায় ছটফট করলেও বেশি প্রতিবাদ, চিৎকার করবেন না। কারণ এই সবের অধিকার আপনারা হারিয়েছেন। তাই প্রতিবাদ করতে হলে ভোট বাক্সে করুন। তবেই এসবের বদল হবে আর প্রতিবাদ সার্থক হবে।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

মুজিবুরের ধানমণ্ডির বাড়ি ভাঙচুর, আগুন

গত ৫ ফেব্রুয়ারি অনলাইনে বাংলাদেশের জনতার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সময় রাত ন'টায় হাসিনার অনলাইন ভাষণ শুরু হওয়ার আগে থেকেই সোশাল মিডিয়ায় জেহাদিদের তরফে ভাইরাল হতে থাকে ধানমণ্ডি অভিমুখে বুলডোজার অভিযানের বার্তা। হাসিনার ভাষণ চলাকালীন ধানমণ্ডি এলাকার চিত্র ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। মুজিবুর রহমানের বাসভবন লুঠ করতে থাকে উন্মত্ত জেহাদিরা। মিউজিয়ামের ছবিগুলি ভেঙে তছনছ করা হয়। বাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় জেহাদিদের দল। এই বাড়িটিতে আক্রমণের পর হাসিনার বাসভবন সুধা সদনেও অগ্নিসংযোগ করে এই নরপিশাচের দল। ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা এবং আইএসআইএসের পতাকা তোলে তারা।

শেখ মুজিবুর একদা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম লিগের ছাত্র নেতা। জেহাদি মুজিবুর ১৯৪৬ সালে হিন্দু গণহত্যায় শামিল হয়েছিলেন। তাতে প্রাণ গিয়েছিল অসংখ্য হিন্দু নর-নারীর। ১৯৭১-এর পর সেই মুজিবুর হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে ঘটে সামরিক অভ্যুত্থান। নিহত হন মুজিবুর। জেহাদির মৃত্যু ঘটে জেহাদিদের হাতেই। গত বছরের ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ফের ঘটে জেহাদি অভ্যুত্থান। এবার শেখ মুজিবুরের মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় জেহাদি জনতা। লুঠ হয় হাসিনার বাসভবন। তারপর ঘটল গত ৫ ফেব্রুয়ারির এই ঘটনা। ওইদিন রাতে যখন দাউ দাউ করে জ্বলছে শেখ মুজিবুর ও হাসিনার বাসভবন, তখন যেন জ্বলে পুড়ে খাক হলো ১৯৭১-পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের বেঁচে থাকা সভ্যতা ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা। হিংস্র মোল্লাবাদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করল। শিক্ষিত মানুষ প্রতিবাদ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, বামপন্থী ন্যারেটিভ, মিথ্যা সেকুলারিজমের জালে জড়িয়ে গেলে হয়তো এটাই হয়। এভাবেই জ্বলেছিল নালন্দা, সাম্প্রতিক অতীতে ফ্রান্সের মার্সেইয়ের লাইব্রেরি। এবার জ্বলল ধানমণ্ডি। কোনোদিন কি এই জেহাদিদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি? এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে হিন্দু নির্যাতন চলেছে। ভারতীয় ভূখণ্ডসমূহ ক্রমশ ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দুরা ঘুমিয়ে থেকে আজ ২৮ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুরা ঘুমিয়ে। কটা জেলায় হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে গেল, কেউ জানে না। ওবিসি সংরক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের জেহাদি তোষণ চলছে, ফিরহাদ হাকিম তো 'মুসলিম দাওয়াত' দিয়েই দিয়েছেন। হুমায়ুন কবীর বলছে, 'আমরা ৭০, হিন্দুরা ৩০। হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেব।' পশ্চিমবঙ্গেও বুঝছে না কেউ। বাংলাদেশে মুজিবুরের বাড়ি জ্বলছে, পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপ্রতিমা, কালীমূর্তি ভাঙচুর, ৬৭ শতাংশ হিন্দুদের রাজ্যে নদীয়া থেকে কলকাতা, পুলিশ পাহারায় সরস্বতী পূজা করতে হচ্ছে। বার্তা পরিষ্কার। গদির জন্য রাজ্য সরকার হিন্দুদের ১০০০ টাকার ভিক্ষা দিয়ে নাচাচ্ছে। আত্মঘাতী হিন্দুরা কি জানে ২০২৬ পরবর্তী পর্যায়ে মুজিবুরের বাড়ির মতো পশ্চিমবঙ্গেও কত কী জ্বলবে?

—অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়,
খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা।

মা প্রভাবতী দেবীকে লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র

সুতপা বসাক ভড়

''ভারতবর্ষ ভগবানের বড়ো আদরের স্থান, এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভারতের বড়ো আদরের দেশ।'' ১৯৯২ সালে মা প্রভাবতী দেবীকে কটক থেকে এক রবিবার লেখা সুভাষচন্দ্র বসুর একটি চিঠির অংশবিশেষ।

২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭ সালে সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক জগতে যে আলোড়ন হয়েছিল, তার প্রভাবে তিনিও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র বসুকে আমরা দেখতে পাই একজন পরিব্রাজক এবং সমাজ সংস্কারকরূপে। মাকে লেখা ১৯১২-১৩ সালের চিঠিগুলির মধ্যে দেখতে পাই, তাঁর দেশপ্রেমের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ রয়েছে। দেশভক্তিকে তিনি মাতৃপূজায় উন্নীত করেছেন।

তিনি লিখছেন— ''দেখ, মা, ভারতে যাহা চাও সবই আছে— 'প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি, আবার মনোহর শরৎ ও বসন্তকাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি স্বচ্ছ সলিলা, পুণ্যতোয়া গোদাবরী দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে, কী পবিত্র নদী! দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র রামায়ণে পঞ্চবটীর কথা মনে পড়ে— তখন মানসনেত্রে দেখি সেই তিনজন— রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া, সুখে, মহাসুখে স্বর্গীয় সুখের সহিত গোদাবরী তীরে কালহরণ করিতেছেন, সাংসারিক দুঃখের ও চিন্তার ছায়া আর তাঁহাদের প্রসন্ন বদনকমলকে মলিন করিতেছে না। প্রকৃতির উপাসনা ও ভগবানের আরাধনা করিয়া সমগ্র বিনদনে মহা আনন্দে কাল কাটাইতেছেন। —আর এদিকে আমরা সাংসারিক দুঃখানলে নিরন্তর পুড়িতেছি। কোথায় সে সুখ, কোথায় সে শক্তি!

আমরা শান্তির জন্য হাহাকার করিতেছি! ভগবানের চিন্তন ও পূজন ভিন্ন আর শান্তি নাই। যদি মর্ত্যে কোনো সুখ থাকে তাহা হইলে গৃহে গৃহে গোবিন্দের নামকীর্তন ভিন্ন আর সুখের উপায় নাই। আবার যখন ঊর্ধ্বে দৃষ্টি তুলি, মা, তখন আরও পবিত্র দৃশ্য দেখি। দেখি পুণ্য-সলিলা জাহ্নবী সলিলভার বহন করিয়া চলিয়াছে। আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দেখি বাল্মীকির সেই পবিত্র তপোবন, দিবারাত্র মহর্ষির পবিত্র কণ্ঠোদ্ভূত পূত বেদমন্ত্রে শব্দায়িত, দেখি বৃদ্ধ মহর্ষি অজিনাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার পদতলে দুইটি শিষ্য— লব ও কুশ, মহর্ষি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রূর সর্পও নিজের বিষ হারাইয়া, ফণা তুলিয়া নীরবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে। গোকুল গঙ্গায় সলিল পান করিবার জন্য আসিয়াছে— তাহারও একবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র মন্ত্রধ্বনি শুনিতেছে। শুনিয়া কর্ণদ্বয় সার্থক করিতেছে। নিকটে যে হরিণ শুইয়া আছে, সমস্তক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া আছে। রামায়ণে সবই পবিত্র, সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্যন্তও পবিত্র, কিন্তু হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধর্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে পারি না। আর একটি পবিত্র দৃশ্য মনে পড়িতেছে। ত্রিভুবনতারিণী কলুষহারিণী ভাগীরথী চলিয়াছেন— তাঁহার তীরে যোগীকুল বসিয়া আছেন, কেহ অর্ধনির্মীলিত নেত্রে প্রাতঃসন্ধ্যায় নিমগ্ন, কেহ কাননের পুষ্পরাজি তুলিয়া প্রতিমা গড়িয়া চন্দন ধূপ প্রভৃতি পবিত্র সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া পূজা করিতেছেন, কেহ মন্ত্রোচ্চারণে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন, কেহ গঙ্গার পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছেন, কেহ গুন গুন করিয়া গান করিতে করিতে পূজার জন্য বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পবিত্র, সকলই নয়ন ও মনের প্রীতিকর।

...মা, আমি যখন চিঠি লিখিতে বসি তখন পাগলের চেয়েও পাগল। কি লিখিব ভাবিয়া লিখিতে বসি না এবং কি বা লিখিতে পারি তাহা জানি না। মনে যে ভাবটি আসে তাহাই লিপিবদ্ধ করি, ভাবি না কি লিখিতেছি বা কেন লিখিতেছি।''

মা প্রভাবতী দেবীকে লেখা পত্রের কিছু অংশ থেকে আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চিন্তন ও মননের একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে অবহিত হলাম। যে কোনো মানুষের সম্বন্ধে পরিচিত হবার একটি অন্যতম উপযুক্ত মাধ্যম হলো চিঠিপত্র। মায়ের সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক মানসিকতাকে সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাষিত করে তুলেছেন। সেখানে কোনো বিধিনিষেধের গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। এখানে আমরা সন্তান ও মায়ের মানসিক মেলবন্ধনের অপূর্ব এক নিদর্শনের পরিচয় পেলাম। একটি প্রেরণাদায়ী ও অনুসরণযোগ্য পত্রালাপ আমাদের পথপ্রদর্শন করবে, এমনটাই আশা করি।

তথ্যসূত্র :

জরুরি কিছু লেখা—সুভাষচন্দ্র বসু।

মায়ালজিয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি

ডা: প্রকাশ মল্লিক

বয়স বাড়ার সঙ্গী শরীরের নানা অংশে ব্যথা বেদনা। এছাড়া আচমকা কোনো আঘাত থেকে বা দীর্ঘদিনের শারীরিক কোনো সমস্যা থেকে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে, যন্ত্রণা হয়। এই মাসল পেন বা মাংসপেশির যন্ত্রণাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় মায়ালজিয়া।

মায়ালজিয়া কেন হয়?

সারা শরীর জুড়েই রয়েছে অজস্র পেশি। শরীরের যে কোনো অঙ্গ ময়ালজিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। মায়ালজিয়ার পিছনে কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণ থাকে না। বিভিন্ন কারণে ব্যথা হতে পারে। হঠাৎ আঘাতে শিরা ছিঁড়ে, হাড় ভেঙে গিয়ে, পেশিতে টান লেগে যেমন ব্যথা হতে পারে। আবার দীর্ঘদিনের কোনো অসুখের জন্য বা অনেকদিন ধরে কোনো ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস ছাড়ার সময় পেশিতে ব্যথা হতে পারে। শরীরের কোথাও ফুলে গেলে বা প্রদাহ হলে পেশির উপরে তার প্রভাব পড়ে। গর্ভবতী অবস্থায় মহিলাদের কোমরে ব্যথা হয়। চোট, মচকানো, আঘাত বা অন্য কোনো অসুখের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে শুধু নয়, শরীরে ভিটামিন-ই, ডি, বি-১২, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়ামের ঘাটতির জন্যও মায়ালজিয়া হয়। ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়ে ব্যথা হতে পারে। অনেকেই শরীর হাইড্রেটিড রাখতে প্রচুর জল খান। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত জলপানে শরীরে পটাশিয়াম কমতে থাকে। পটাশিয়ামের ঘাটতিতেও ব্যথা হয়। আবার এর উল্টোটাও হয়, ডিহাইড্রেশনের জন্য মাসল ক্র্যাম্প হয়, যা অসম্ভব যন্ত্রণার। এছাড়া শরীরচর্চা করার সময়ে বেকায়দায় পেশিতে টান লেগে মাসল ক্র্যাম্প হতে পারে। বাত থেকে, অর্থোপেডিক অপারেশনের পরেও মাসল পেন হয়। শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে ব্যথা হতে পারে। যেমন মস্তিষ্কে রক্ত জমে গেলেও যন্ত্রণা হয়। অনেক সময় ব্যথার সঙ্গে জ্বর আসে, র‍্যাশ বেরোয়, এটি ডেঙ্গির লক্ষণ। কোভিডেরও অন্যতম লক্ষণ ছিল মাসল পেন। এমন হাজারটা কারণ আছে মায়ালজিয়ার।

চিকিৎসা

চিকিৎসার জন্য ব্যথার ধরনের পাশাপাশি রোগীর মেডিকেল হিস্ট্রি জানা জরুরি। ঠিকমতো চিকিৎসার জন্য ব্যথা কতদিন ধরে হচ্ছে, ধীরে ধীরে বাড়ছে, নাকি মাঝে মাঝে হচ্ছে সেটা জানা দরকার। একটানা কাজের পর বা খুব বেশি হাঁটাচলা থেকে ব্যথা হতে পারে। ক্রনিক কোনো রোগ আছে কিনা, যেমন ডায়াবেটিস, কিডনির সমস্যা, অটোইমিউন সমস্যা আছে কিনা দেখতে হয়। আমরা ব্যথা অনুভব করি নার্ভ বা স্নায়ুর জন্য। ব্যথার উৎপত্তিস্থলের স্নায়ু মস্তিষ্কে সঙ্কেত দেয় বলে যন্ত্রণা অনুভব করি। পেশির সঙ্গে স্নায়ুও জড়িত। তাই যে স্থানে ব্যথা হয় তার চারপাশে খুঁটিয়ে কারণ খুঁজতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এক্স-রে, এমন আর আই ইত্যাদি করে দেখে নেওয়া হয়।

পেশির ব্যথা অন্য রোগেরও লক্ষণ হতে পারে

শরীরে কোথাও এক-দুদিন ব্যথা হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে সেটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই বলে মনে করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু ব্যথা যদি থেকে থেকেই ফিরে আসে, তাহলে সচেতন হতে হবে। দেখতে হবে তার সঙ্গে অন্য কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। যেমন জ্বর আসা বা র‍্যাশ বেরোনো ইত্যাদি।

ব্যথার ওষুধ

অল্পতেই ব্যথা কমানোর ওষুধ খাওয়া সমর্থন করেন না অধিকাংশ চিকিৎসক। দুর্ঘটনার ব্যথা পাওয়া ছাড়াও যদি বারবার ব্যথা ফিরে আসে তার মানে শরীরে কোনো সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসার প্রয়োজন। পায়ে যদি ব্যথা হয় তাহলে সে হাঁটার সময়ে সচেতন হবে। ব্যথার ওষুধ খেয়ে ধামাচাপা দিলে শরীরের ভিতরে সমস্যার সমাধান হবে না, ফলে আরও ক্ষতি হবে। তাছাড়া অনেক সময় ব্যথার ওষুধ বন্ধ করে দিলে ব্যথা প্রবল আকারে ফিরে আসে। একে রিবাউন্ড পেন বলে। ডাক্তাররা সাধারণত পেনকিলার দেন না। দেওয়া হয় মাসল, নার্ভ রিল্যাক্স করার ওষুধ। খুব প্রয়োজনে খেতে পারেন প্যারাসিটামল। আর ওষুধের বিকল্প 'রিপ' পদ্ধতি।

RIPE পদ্ধতি আসলে কী?

R মানে রেস্ট বা বিশ্রাম নেওয়া, I অর্থাৎ আইস কমপ্রেস বা ঠাণ্ডা সেঁক দিয়ে ব্যথা কমানো, যদি কোনো জায়গায় প্রদাহ হয়ে গরম হয়ে যায় তাহলে ঠাণ্ডা সেঁক দিতে হবে। P হলো ফিজিওথেরাপি। ক্রনিক ব্যথা নিয়ে যার সমস্যা, তারা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ফিজিওথেরাপি করাতে পারেন। এছাড়া রোড যদি হাত, পা, কোমরের কয়েকটি ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করা যায় তাহলে স্পন্ডিলাইসিস বা ফ্রোজেন শোল্ডারের মতো সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া যায়। যেমন রোজকার কাজে হাত উপরে তোলা বা পাশে ছড়ানো কমই হয়। তাই মনে করে এমন ফ্রিহ্যান্ড করতে হবে, যাতে পেশি কাজ করবে। E এলিভেটিং। প্রয়োজনে পা-হাত একটু উঁচু করে রাখতে হবে। এতে প্রদাহ কিছুটা কমে যেতে পারে।

পেশির ব্যথা কারণ ভিন্ন, তাই চিকিৎসা পদ্ধতিও ভিন্ন। মনে রাখতে হবে, ব্যথা অনেক রোগের লক্ষণ। তাই ক্রনিক ব্যথা ফেলে না রেখে চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফসপ্রসূ।

এবারের আয়করে স্বস্তি বেশি, অস্বস্তি কম মধ্যবিত্তের

শেখর সেনগুপ্ত

এবারের বাজেটের প্রতিটি শব্দ যখন উচ্চারিত হচ্ছিল, বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের কণ্ঠস্বর থেকে, কোটি কোটি মানুষের চক্ষু ও কর্ণ তখন দূরদর্শনের পর্দায় আবদ্ধ। শিক্ষিত, সচেতন মানুষ ওই সময়ে বাক্যালাপ করার মতো অবস্থায় ছিলেন না। পরে বাজেট-পাঠ শেষ হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চারিত হতে থাকে হরেক কিসিমের মন্তব্য। সেই সকল মন্তব্য ও অনুভূতিকে চুলচেরা বিশ্লেষণের পর মনে হয়েছে, এদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত এবং অবশ্যই সুভদ্র। অনেকেই এই বাজেটের সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ টিভি নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে উপভোগ করেছেন। তারা প্রফুল্ল। বিশেষত নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ যেভাবে প্রফুল্লতা প্রকাশ করলেন, তাদের সুন্দর বিন্যাসকে অগ্রহ্য করতে পারি না রাজনীতিবিযুক্ত নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিরূপে। আমি নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যবিত্ত। তাই আয়করের নিম্নোক্ত বাস্তব রূপরেখাকে অবশ্যই আনন্দ ও স্বস্তিদায়ক মনে হয়েছে এবং আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন, এমন পরিচিতদের সংখ্যা বিস্তর। আয়করে এরকম ছাড় দেবার জন্য সরকারের কোষাগারের ক্ষতি ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। কিন্তু পরিবর্তে দেশে ঘটবে ব্যবসা ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি।

সাধারণ আয় (টাকায়)	প্রদেয় করের হার (শতাংশে)
০—৪ লক্ষ	০
৪—৮ লক্ষ	৫
৮—১২ লক্ষ	১০
১২—১৬ লক্ষ	১৫
১৬—২০ লক্ষ	২০
২০—২৪ লক্ষ	২৫
২৪ লক্ষের বেশি	৩০

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সকল সরকারি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ক্ষমতা বাড়বে, সমবায় সংস্থাগুলিরও স্বস্তি বাড়বে। বৃদ্ধি পাবে উপার্জনে স্বনির্ভরতা। এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনায় ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা যাঁর বার্ষিক উপার্জন, তাঁর করদানের ক্ষেত্রে ৮০ হাজার টাকা অবধি সাশ্রয় হবে।

বেতন, পেনশন, ফিক্সড ডিপোজিট হতে সুদ বাবদ আয়ের ক্ষেত্রে চাকুরীজীবী শ্রেণীর ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জনের উপর কোনো আয়কর নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হবে ৭৫ হাজার টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন, অর্থাৎ ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্তদের কোনো আয়কর দিতে হবে না। নর্মাল ইনকাম বা সাধারণ আয়ের এই বিষয়টি বাদে ইক্যুইটি শেয়ার, ইক্যুইটি-নির্ভর মিউচুয়াল ফান্ড, জমি-বাড়ি-ফ্ল্যাট ভাড়া ও বিক্রি, লটারি, ঘোড়দৌড়, তাসের মতো খেলা, অনলাইন গেমস্, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি সূত্র হতে আয় এবং দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ (লং অ্যান্ড শর্ট-টার্ম ক্যাপিটাল গেইন)-এর ক্ষেত্রে আয়করের বিভিন্ন হার প্রযুক্ত হবে, উপার্জনের এই ক্ষেত্রগুলি বিশেষ আয় বা স্পেশাল রেট ইনকাম হিসেবে এবারের অর্থ বাজেটে চিহ্নিত হয়েছে। সাধারণ আয়ের ক্ষেত্রে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে প্রস্তাবিত করকাঠামোটি সারণিতে দেওয়া হলো।

আয় (টাকা)	বর্তমানে প্রদেয় কর (টাকা)	নতুন কর কাঠামো (টাকা)	আয়কর কমেছে (টাকা)
৮০০০০০.০০	৩০০০০.০০	২০০০০.০০	১০০০০.০০
১০০০০০০.০০	৫০০০০.০০	৪০০০০.০০	১০০০০.০০
২০০০০০০.০০	২৯০০০০.০০	২০০০০০.০০	৯০০০০.০০
৫০০০০০০.০০	১১৯০০০০.০০	১০৮০০০০.০০	১১০০০০.০০

এছাড়াও সাধারণ আয়ের মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপার্জনের ক্ষেত্রে রিবেটের পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬০০০০ টাকা।

এর মাধ্যমে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাধারণ আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়ের ব্যবস্থাটি বলবৎ হয়েছে। আয়কর আইনের ৮৭(এ) ধারা অনুযায়ী ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে ৬০০০০ টাকা রিবেট পাওয়া যাবে।

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাজেট

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদে অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উল্লেখ আছে। বাজেট একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। সংবিধানে তার কোনো উল্লেখ নেই। সরকারের আয় ও ব্যয়ের প্রতিফল বাজেটে ঘটে থাকে। বাজেটের সঙ্গে সঙ্গে অর্থবিল পেশ করা হয়ে থাকে। এবার বাজেট অধিবেশনে আয়কর সংশোধনী আইন পেশ করা হয়েছে যার ফলে কর কাঠামো সহজ করা সম্ভবপর হবে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটের আয়তন ৫০,৬৫,৩৪৫ কোটি টাকা। যা ২০১৯-২০০০ অর্থবর্ষের দ্বিগুণ। এটি সম্ভব হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সংগ্রহ দ্বিগুণ হবার কারণে। বাজেটের ফলে উপকৃত হবে গরিব, যুবা, কৃষক, নারী। এই বাজেট মোদী ৩.০ সরকারের এবং অর্থমন্ত্রী হিসেবে নির্মলা সীতারামনের অষ্টম বাজেট। পাঁচটি ন্যাশন্যাল সেন্টার যার এক্সসেলেন্স প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ও প্রযুক্তির গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ২০১৪ সালের পরে প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি আইআইটি-র আসন সংখ্যা ৬৫০০ বৃদ্ধি করা হবে। পাটনা আইআইটি'র সম্প্রসারণ ঘটানো হবে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স'র জন্য পৃথক তিনটি সেন্টার যার এক্সসেলেন্স নির্মাণের ব্যয় ধরা হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। বিজ্ঞান উন্নয়ন খাতে ৫৫,৬৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষা খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ১,২৮,৬৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৯৮,৩১১ কোটি টাকা। প্রত্যেক জেলা হসপিটালে কর্কট রোগের চিকিৎসার জন্য কেন্দ্র খোলা হবে। ডাক্তারি পড়ুয়াদের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে ১০,০০০ আসন বৃদ্ধি করা হবে। যাতে ভবিষ্যতে ডাক্তারহীন গ্রাম না থাকে। ৩৬টি জীবনদায়ী ওষুধের কর মুকুব করা হয়েছে এবং সব জীবনদায়ী ওষুধের ওপর থেকে পাঁচ শতাংশ কর প্রত্যাহার করা হয়েছে।

পরিকাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনীতিবিদরাও পরিবহণে যাতায়াত করেন। এই খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫,৪৮,৬৪৯ কোটি টাকা। এছাড়াও গ্রামীণ উন্নয়নে ২,৬৬,৮১৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। নগর উন্নয়নে এক লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ঠিকাদার কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও বিমার সুরক্ষা পাবেন প্রায় এক কোটি ঠিকাকর্মী। বর্তমানে ডেলিভারি বয় কেবলমাত্র খাবার পৌঁছে দেয় না, পণ্য সরবরাহ, গৃহসামগ্রী সরবরাহ, বাজার, ওষুধ প্রভৃতি সরবরাহ করে থাকেন। অসংঘটিত ক্ষেত্রে কর্মরত যুব সমাজ এতে উপকৃত হবে।

ভারতের অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রের অবদান অনস্বীকার্য। কৃষি ও সহায়ক ক্ষেত্রে ১,৭১,৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষাণ ক্রেডিট কার্ডের লোনের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ টাকা করা হয়েছে। গ্রামীণ ভারতে ডেয়ারি ও ফিশারির অবদান লক্ষণীয়। ডেয়ারি ও ফিশারি প্রকল্পের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০০টি কম উৎপাদনশীল জেলাগুলির উন্নতিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

স্কুল ও কলেজে পড়ানো হবে জিও সায়েন্স। ন্যাশনাল জিও সেবা মিশনের কাজ শুরু হবে। গ্রামীণ সরকারি স্কুলগুলিতে ব্রডব্র্যান্ড কানেকশনের ব্যবস্থা করা হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রযুক্তির সুবিধা পেতে পারে।

এমএসএমই ভারতের রপ্তানির ৪৫ শতাংশ অধিকার করে আছে। স্টার্ট আপের জন ১০,০০০ কোটি টাকার ফান্ড তৈরি করা হবে। মহিলা, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি মহিলাদের প্রথম পাঁচ লক্ষ উদ্যোগপতিকে ২ কোটি টাকা লোন দেওয়া হবে। ২৭টি স্থিরকৃত ক্ষেত্রে স্টার্ট আপ প্রকল্পে লোন ১০ কোটি থেকে ২০ কোটি টাকা করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় ৬০,০৫২ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভরতুকির জন্য ৪,৮৩,৪০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

নগর উন্নয়নে বরাদ্দ ৯৬,৭৭৭ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ, কৃষি, কর, নগর উন্নয়নে সংস্কার করা হবে। পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি সাহায্য নেওয়া হবে। পৃথিবীব্যাপী কয়লা, গ্যাসের ভাণ্ডার কমে আসছে। সেজন্য বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাহায্য নেওয়া হবে।

রেল বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। পিপিপি মডেলে রেলের জন্য মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি টাকা। রেলের নতুন লাইন দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ করা হবে যার ঘোষণায় ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। ফ্রেট করিডোরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫,৪৯৯ কোটি টাকা। শুধুমাত্র বর্তমান ট্রাকের দ্বিগুণ সম্প্রসারণ নয়, ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস স্টেশনের উন্নতি, যাত্রী সুরক্ষার বাড়তি সতর্কতা প্রদান করা হবে।

বাম আমল থেকে বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনার কথা বলা হয়ে থাকে। সড়ক উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৫,৬৭৫ কোটি টাকা। রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তি ১৯,৪৮৩ কোটি টাকা। জলপথ ও সাগরমালা প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তি ১৬,৩০০ কোটি। মেট্রোর অসমাপ্ত কাজের জন্য বরাদ্দ ৯০৬ কোটি টাকা। নিন্দুকে বলে বুদ্ধগয়ার জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে, তারা জানেন না বেলুড় মঠের জন্য বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৩০.৩ কোটি টাকা।

এবারের বাজেট মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছে। ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কর মুক্ত রাখা হয়েছে। এছাড়া ৭৫,০০০ টাকা প্রসিত ছাড় (Standard Deduction) এর ছাড় যুক্ত করলে যা দাঁড়াবে ১২,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়কর মুক্ত হবে। যদি আয় ১২ লক্ষ ৭৫০০০ টাকা অতিক্রম করে তবে আয়করের কাঠামো হবে নিম্নরূপ :

আয়	কর
শূন্য থেকে ৪ লক্ষ	শূন্য
৪ লক্ষ থেকে ৮ লক্ষ	৫ শতাংশ
৮ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ	১০ শতাংশ
১২ লক্ষ থেকে ১৬ লক্ষ	১৫ শতাংশ
১৬ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ	২০ শতাংশ
২০ লক্ষ থেকে ২৪ লক্ষ	২৫ শতাংশ
২৪ লক্ষের বেশি হলে	৩০ শতাংশ

এর ফলে ১২ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যক্তিরা ৮০,০০০ টাকা বাৎসরিক সঞ্চয় করতে পারবে। ১৮ লক্ষ টাকার আয়ের ব্যক্তিরা ৭০,০০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন এবং ২৫ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যক্তিরা ১,১০,০০০ টাকা কর সাশ্রয় করতে সমর্থ হবেন।

প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে সুদ থেকে উৎসমূলে টিডিএস ৫০০০০ টাকার পরিবর্তে ১,০০,০০০ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয়ে ৬.৫ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ সুদ পেলে উৎসমূলে টিডিএস দিতে হবে না। আবার, কিছু মানুষ বাড়ি ভাড়ার আয় থেকে সংসার চালান। বাড়িভাড়া থেকে আয় ৪ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৬ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, বাড়িভাড়া থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে উৎসমূলে কোনো কর কাটা (টিডিএস) হবে না, যা ১২ লক্ষ টাকার অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রবীণ নাগরিকদের পেনশনের জন্য সরকারের ব্যয় হবে ২,৭৬,৬১৮ কোটি টাকা।

প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে সুদ থেকে উৎসমূলে টিডিএস ৫০০০০ টাকার পরিবর্তে ১,০০,০০০ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয়ে ৬.৫ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ সুদ পেলে উৎসমূলে টিডিএস দিতে হবে না।

আমাদের দেশের Geo-Political Situation-এ (ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে) আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪,৯১,৭৩২ কোটি টাকা। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ) বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২,৩৩,২১১ কোটি টাকা।

তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের জাতীয় আয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আইটি ও টেলিকম সেক্টরের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৮১,১৭৪ কোটি টাকা। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের বরাদ্দ ৬৫,৫৫৩ কোটি টাকা। তথ্যপ্রযুক্তির পর শিল্প ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। উত্তর-পূর্ব ভারত সব সময় অবহেলিত ছিল। পূর্ব ভারতের অসমে সার কারখানা তৈরির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়া, উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৬,৯১৫ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের মোট প্রাপ্তি ৫২,৩৬৪ কোটি টাকা। ভারতে ৬.৫ লক্ষ গ্রাম আছে। ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংকের পাশাপাশি পোস্ট অফিস ব্যাংক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃহত্তর যোগাযোগ মাধ্যমের অঙ্গ হিসেবে ১.৫ লক্ষ পোস্ট অফিসকে সার্বিক উন্নতি ঘটানো হবে, যা গ্রামীণ ভারতের যোগাযোগ ও স্বল্প সঞ্চয়ের আধার হিসেবে বিবেচিত হবে। ২০৪৭ সাল ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তিনটি মন্ত্র বাজেটের পূর্বে ঘোষণা করেছেন :

অন্তর্ভুক্তীকরণ, উদ্ভাবন ও আমূল পরিবর্তন।

প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত ১১ বছরে ২৩ কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার উপরে উঠে এসেছে। ১৪২ কোটির দেশে যা অভূতপূর্ব। অন্য একটি দিক আর্থিক শৃঙ্খলার অঙ্গ হিসেবে বাজেট ঘাটতি ৪.৮ শতাংশ থেকে ৪.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার কোভিড পরবর্তী সময়ে ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষে ৯.২ শতাংশ (যা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল), ২০২২-২০২৩ ৭ শতাংশ, ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে ৮.২ শতাংশ, ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে ৬.৪ শতাংশ এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটের অভিমুখ বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে।

(লেখক যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ)

প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ২০২৫-’২৬-এর কেন্দ্রীয় বাজেট

কর্নেল ড. কুণাল ভট্টাচার্য

গত অর্থবর্ষে (২০২৪-’২৫) প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬.২২ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৫-’২৬ আর্থিক বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকায় (৭৯ বিলিয়ন ডলারে) দাঁড়িয়েছে। বাজেট নথি অনুযায়ী, এই বছরে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ গত আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা প্রায় ৯.৫৫ শতাংশ বেশি এবং গত আর্থিক বছরের সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দের (৬.৪১ লক্ষ কোটি) তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ বেশি।

এই বছরে সামরিক বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের জন্য মূলধনী ব্যয় (ক্যাপিটাল আউটলে) ধরা হয়েছে ১.৯২ লক্ষ কোটি টাকা, যা গত আর্থিক বছর হতে ৪.৬ শতাংশ বেশি। প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম কেনাকাটা সংক্রান্ত কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি আগামীদিনে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য এই ব্যয়বরাদ্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত যুদ্ধবিমান, নৌবহর এবং আর্টিলারি সিস্টেম (কামান, গোলাবারুদ) ক্রয়-সহ সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। ১.৮ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা মূলধন অধিগ্রহণ বা ক্যাপিটাল অ্যাকুইজিশনে ব্যয় করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাকি ৩১,২৭৭ কোটি টাকা প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং দেশজুড়ে প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে ব্যয় করা হবে বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এই আর্থিক বছরে প্রতিরক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয় (রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার) ধরা হয়েছে ৩.১১ লক্ষ কোটি টাকা। সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও আধিকারিকদের পেনশন খাতে এই অর্থবর্ষে ব্যয়বরাদ্দ ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা। এই অর্থবর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা বরাদ্দ ভারতের প্রত্যাশিত জিডিপি-র (মোট দেশীয় উৎপাদনের) ১.৯ শতাংশ এবং সামগ্রিক কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেটের ১৩.৪৫ শতাংশ।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে হয়ে থাকে আধুনিকীকরণ ব্যয় (মডার্নাইজেশন আউট্‌লে)। দেশীয় উৎপাদনকারী এবং সরবরাহকারীদের থেকে অস্ত্র (ওয়েপন সিস্টেম) এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার জন্য এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। স্থানীয় বা দেশীয় স্তরে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূলধনী বরাদ্দের ৭৫ শতাংশ অর্থের সংস্থান ছিল গত আর্থিক বছরের প্রতিরক্ষা বাজেটে।

প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি, শক্তি বা জ্বালানি এবং আধুনিকীকরণের উপর জোর : ভারতীয় বাহিনীর সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের কৌশলগত পরিকল্পনার প্রমাণ দিচ্ছে বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি, শক্তিক্ষেত্র এবং আধুনিকীকরণের উপর জোরের মতো বিষয়সমূহ। কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যরত এবং অবসরপ্রাপ্ত— সামরিক বাহিনীর উভয় শ্রেণীর কর্মীদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই বিষয়টি প্রতিরক্ষা বাজেটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। এই অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

(১) ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরে প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকা।

(২) প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে মূলধনী ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা।

(৩) প্রতিরক্ষা পেনশন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, যা গত অর্থবর্ষ অপেক্ষা ১৩.৫ শতাংশ বেশি।

সীমান্ত সংঘর্ষ এবং বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সামরিক সংঘাতের দরুন বিভিন্ন দেশের সরকারের দ্বারা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিরক্ষা বাজেট। অপ্রত্যাশিত সামরিক চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবিলা এবং সেগুলির উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে উন্নত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো উন্নত করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে বিভিন্ন

প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) বাজেট বরাদ্দ

২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৬, ৮১৬.৮২ কোটি টাকা। ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরের বাজেটে ডিআরডিও পেয়েছিল ২৩, ৮৫৫.৬১ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবর্ষে ডিআরডিও-র বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৪১ শতাংশ।

দেশ। এলএসি বা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চীনের সঙ্গে চলমান অচলাবস্থা মোকাবিলার পাশাপাশি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষায় সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করার মধ্য দিয়ে ভারত সরকারের কৌশলগত পরিকল্পনার নানা ঝলক ও নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। অপারেশনাল (সামরিক) চ্যালেঞ্জ সামলানোর পাশাপাশি কর্তব্যরত ও অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষাকর্মীদের কল্যাণের লক্ষ্যেও প্রচেষ্টারত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

প্রতিরক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয়ে বিরাট বৃদ্ধি : প্রতিরক্ষা বাজেটের একটি বড়ো অংশ— ৩.১১ লক্ষ কোটি টাকা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রাজস্ব ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয়বরাদ্দ ছিল ২.৮৩ লক্ষ কোটি টাকা। রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি সামরিক প্রস্তুতিপর্ব বজায় রাখা এবং চলমান সামরিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বদানের প্রতি দিকনির্দেশ করে। রাজস্ব ব্যয় মূলত সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে ব্যয়, যার মধ্যে রয়েছে বেতন, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন বা ক্রয় ইত্যাদি। রাজস্ব ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি ভারতের সামরিক বাহিনীর যুদ্ধপ্রস্তুতি-সহ নিরাপত্তা বিষয়ক নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক হবে।

সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে মূলধনী পরিকল্পনা (ক্যাপিটাল আউট্‌লে) : ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে এই খাতে মূলধনী ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা। বিগত অর্থবর্ষে (২০২৪-'২৫) মূলধনী ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১.৭২ লক্ষ কোটি টাকা। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণ, উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং অস্ত্র সংগ্রহের জন্য এই তহবিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মূলধনী ব্যয় হলো 'আত্মনির্ভর ভারত' যোজনার অধীনে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অন্তর্গত বিষয়। এই বিষয়টিতে কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বদানের প্রেক্ষিতটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন পরবর্তী প্রজন্মের যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন এবং ড্রোন সংগ্রহের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোগত উন্নয়নে নিশ্চিতভাবে সহায়ক হবে এই মূলধনী ব্যয়বরাদ্দ। ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি ভারতের নজরদারি এবং (চীনের ক্ষেত্রে) প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর একটি প্রভাবশালী অবস্থান বজায় রাখার লক্ষ্যে ভারত যে কাজ করে চলেছে তার প্রমাণ এই অর্থবর্ষে মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি।

অসামরিক প্রক্রিয়াসমূহের জন্য উচ্চ বরাদ্দ : কার্যকরী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (অসামরিক)-এর জন্য ২০২৫-'২৬

অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের পেনশন বৃদ্ধি ও প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্প বা ইসিএইচএস

এই বাজেটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রতিরক্ষা পেনশন খাতে অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বাবদ বরাদ্দ হয়েছিল ১.৪১ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে ১৩.৫ শতাংশ বেড়ে তা হয়েছে ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা। এই বরাদ্দ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী হতে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী এবং তাঁদের পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা দান করবে। তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে দায়বদ্ধ সেই বিষয়টিকে তুলে ধরে প্রতিরক্ষা পেনশন খাতে এই ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি।

আগামীদিনে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র হতে অবসরপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও রয়েছে ওআরওপি বা এক পদ-এর পেনশনের মতো প্রকল্পের বাস্তবায়ন। এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে পেনশন খাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুসারে, 'এক্স-সার্ভিসমেন কন্ট্রিবিউটরি হেলথ্ স্কিম' বা ইসিএইচএসের জন্য এই অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮,৩১৭ কোটি টাকা। এই অর্থবর্ষে বারদ্দকৃত অর্থ গত আর্থিক বছরের বাজেটের তুলনায় ১৯.৩৮ শতাংশ বেশি।

অর্থবর্ষে ২৮,৬৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত অর্থবর্ষে এই খাতে আর্থিক বরাদ্দ ছিল ২৫,৯৬৩ কোটি টাকা। এই অর্থে সামরিক বাহিনীর সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নীতিগত পরিকল্পনা এবং প্রতিরক্ষা গবেষণায় আর্থিক সহায়তাদান চলবে।

২০২৫-'২৬ সালের প্রতিরক্ষা বাজেট ভারতের কৌশলগত, পরিচালনাগত এবং সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে কল্যাণমূলক বিষয়গুলির প্রতি অগ্রাধিকার আরোপ করে সব ক'টি ক্ষেত্রেই একটি ভারসাম্য বজায় রাখে। এই ভারসাম্য রক্ষার মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

(১) সামরিক বাহিনীকে সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত করে তোলা এবং পরিচালনাগত দক্ষতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি।

(২) প্রতিরক্ষা সামগ্রী ও সরঞ্জাম উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার জন্য সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হলো মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি।

(৩) অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের জন্য পেনশন বরাদ্দ বৃদ্ধি তাঁদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে।

বর্ডার রোডস্ অর্গানাইজেশন (বিআরও) : ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে বর্ডার রোডস্ অর্গানাইজেশনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭,১৪৬.৫০ কোটি টাকা, যা এই খাতে গত আর্থিক বছরের বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৯.৭৪ শতাংশ বেশি।

প্রতিরক্ষা উৎকর্ষতার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী প্রকল্প (ইনোভেশন্স ফর ডিফেন্স এক্সেলেন্স বা iDEX স্কিম) : প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ ও বিকাশের লক্ষ্যে বলবৎ রয়েছে আইডেক্স-নামক একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প। এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৪৯.৬২ কোটি টাকা, যা ২০২৩ সালে বরাদ্দকৃত অর্থ অপেক্ষা প্রায় ৩০০ শতাংশ বেশি।

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী (ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড) : ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীকে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গত অর্থবর্ষের বরাদ্দ অপেক্ষা ৪৩ শতাংশ বেশি। এর ফলে অ্যাডভান্সড্ লাইট হেলিকপ্টার, ডর্নিয়ার এয়ারক্র্যাফ্ট এবং ফাস্ট পেট্রোল ভেসেল ক্রয়ে সক্ষম হবে উপকূলরক্ষী বাহিনী। উল্লেখ্য যে, স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে বিশ্বব্যাপী সামরিক ব্যয় ২,৪৪৩ বিলিয়ন ডলার ছুঁয়েছে। এই ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক করেছে মাত্র দু'টি দেশ— আমেরিকা ও চীন। সেই আর্থিক বছরে ওয়াশিংটন ও বেইজিং যথাক্রমে ৯১৬ ও ২৯৬ বিলিয়ন ডলার তাদের সামরিক খাতে ব্যয় করে। আমেরিকা ও চীন তাদের জিডিপি-র ৩.৪ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করলেও, ভারত তার জিডিপি-র ১.৯ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করেছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি, ভারতীয় সংসদে ২০২৫-'২৬ অর্থবাজেট পেশ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্প পূরণের লক্ষ্যে একটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও ভবিষ্যৎমুখী বাজেট উপস্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। ■

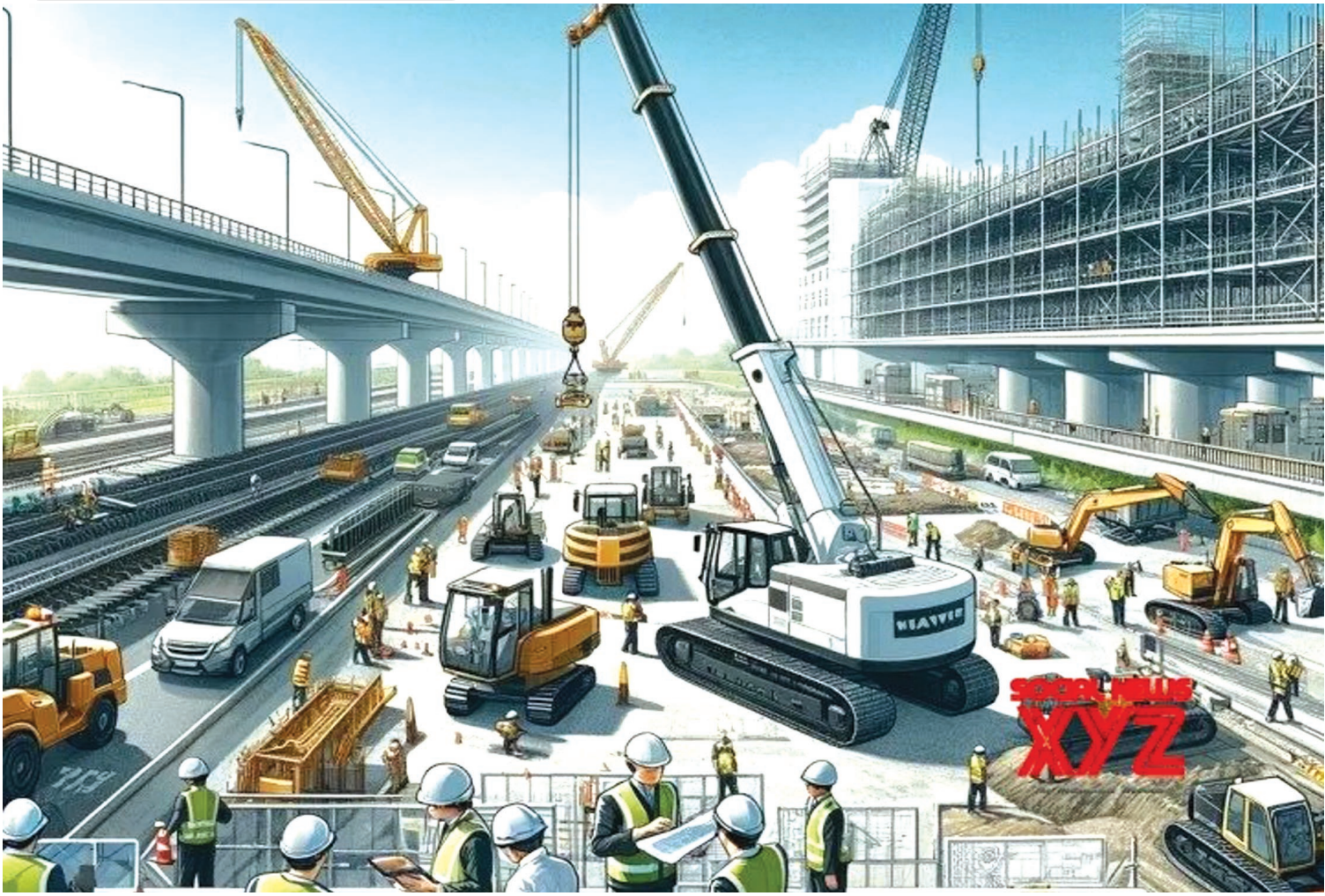

কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেটে শিল্পক্ষেত্রের প্রসঙ্গ (এমএসএমই) এবং পরিকাঠামো উন্নয়নগত ব্যয়বরাদ্দ

সুদীপ্ত গুহ

স্বাধীনতার পর প্রথম ৪৪ বছর লাইসেন্স রাজ, কোটা রাজ,মাশুল সমীকরণ এবং ফেরা আইনের ফলে আমাদের দেশে শিল্প উন্নয়ন হয়নি বললেই চলে। প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, বিদ্যুৎ, খনিজ শিল্প, ইস্পাত সব ক্ষেত্রেই আমাদের দেশ তাকিয়ে থাকতো সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে। ১৯৯১-এ নরসীমা রাও সংস্কার আনলেন, কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে এই সংস্কারের ফল পেল শুধু পরিষেবাক্ষেত্র। এরপরে অটলবিহারী বাজপেয়ী শুরু করলেন পরিকাঠামো, ব্যাংকিং, টেলিকম ইত্যাদি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সংস্কার। কিন্তু পুরো কাজ শেষ করে যেতে পারেননি অটলবিহারী। পরের দশ বছর চীনা সামগ্রীতে ভর্তি হয়ে যায় ভারতের বাজার। কম্পিউটার থেকে শিশুর খেলনা, পুতুল, বিয়ের বেনারসি থেকে দীপাবলির প্রদীপ সবই চীন থেকে আসত। ২০১৪-তে এসে নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন মেক ইন ইন্ডিয়া। শুরু হলো একের পর এক সংস্কার। প্রত্যক্ষ কর, পরোক্ষ কর, ব্যাংকিং সেক্টর থেকে শুরু করে প্রায় ৭০০০-এর উপর সংস্কার আসে আমাদের দেশে। ফল হিসেবে ভারত আজ আর্থিক বৃদ্ধি, ব্যাংকের লাভ, বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ, বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার এবং রপ্তানিতে সর্বকালীন রেকর্ড করেছে। তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে সেই সংস্কারের গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

প্রথমে আসি এমএসএমই-তে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে, যা গত দু' হাজার বছরের বেশি ভারতের (কৌটিল্যর সময়ের আগেও) অর্থনীতির মেরুদণ্ড, যা বাঁচানোর চেষ্টা স্বাধীন ভারতের প্রথম সাড়ে চার দশক হয়ইনি। মহাজনদের কাছে ধার নিয়ে, বাবুদের প্রণামি দিয়ে চলেছে এই ব্যবসা। মুদ্রালোন চালু করে এই ছোটো ব্যবসায়ীদের পুঁজির ব্যবস্থা করেন আগেই নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু এবার কাগজপত্রের ভার কমাতে হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্রেডিট কার্ড। মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের জন্য এর সীমা ৫ লক্ষ। প্রথম

বছর এই কার্ড দেওয়া হবে দশ লক্ষ ব্যবসায়ীকে। এছাড়া মহিলা, অনুসূচিত জাতি ও উপজাতির প্রথম প্রজন্মের উদ্যোগীদের মধ্যে প্রথম পাঁচ লক্ষ আবেদনকারীকে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত লোন দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে পাঁচ বছরের জন্য। এছাড়া Ease of Doing Business-এর ক্ষেত্রে বহু সংস্কার আনা হচ্ছে এবং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণে আরও জোর দেওয়া হচ্ছে।

শ্রমিক বেশি প্রয়োজন (Labour intensive Sector) এমন শিল্পের জন্য যেমন জুতা বা চর্ম ইত্যাদি শিল্পক্ষেত্রে আরও ২২ লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। পুতুল তৈরির শিল্পকে বিভিন্ন সাহায্য দেওয়া হবে, যাতে চীনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায়। বিহারে ফুড প্রসেসিং ট্রেনিঙের জন্য ইনস্টিটিউট তৈরি হবে। সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপ হলো এমএসএমই হওয়ার মাপকাঠি এখন বদলানো হয়েছে। নীচের সারণিতে ব্যাখ্যা করা হলো এই নতুন সংজ্ঞা। এর ফলে বহু নতুন উদ্যোগ সরকারি সুবিধার আওতায় আসবে।

সারণি দ্রষ্টব্য:

এছাড়া শিল্পে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরির দিকে ভীষণ জোর দিয়েছে সরকার। আইআইটি-র আসন বাড়ানো হচ্ছে আরও ৬৫০০। বাড়ছে গবেষণা ক্ষেত্রে বরাদ্দ, যা শিল্পে কাজে আসবে। প্রতিটি জেলায় তৈরি হবে ক্যানসার হাসপাতাল। কৃত্রিম মেধা ক্ষেত্রে ৫০০ কোটি খরচ করতে হবে। সব সরকারি স্কুলে ব্রডব্যান্ড পরিষেবার ব্যবস্থা হবে। ডাক্তারিতে আসন বাড়ানো হবে। আগামীদিনে স্বাস্থ্য পর্যটনে ভারত পৃথিবীর একটা জায়গা করে নেবে।

কেন্দ্র সরকার দেশের সব রাজ্য সরকারকে আগামী ৫০ বছরের জন্য বিনা সুদে দেড় লক্ষ কোটি ধার দেবে যাতে রাজ্য সরকারগুলিকে বিশ্বব্যাংক বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক ব্যাংকের কাছে হাত পাততে না হয় কেন্দ্রীয় পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ম্যাচিং গ্র্যান্ট জোগাড় করার জন্য। যেমন জল জীবন মিশন ইত্যাদি। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিগুলোর জন্য রাজ্যের জিডিপির ০.০৫ শতাংশ আরও ধার দেওয়া হবে। মেরিটাইম ডেভেলপমেন্টে ২৫০০০ কোটি দীর্ঘমেয়াদী বরাদ্দ করা হয়েছে।

AI (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) শিল্পে ডাটা সেন্টার তৈরিতে প্রচুর বিদ্যুৎ প্রয়োজন। দরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ। আমেরিকায় গুগল আমাজন থেকে সব বড়ো কোম্পানি এই ক্ষেত্রে তাই বিনিয়োগ করেছে। ভারতও এই বছর এই ক্ষেত্রে বড়ো বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছে। ১২০টি নতুন ছোটো শহরকে আগামী দশ বছরে বিমান পরিষেবার মধ্যে আনা হবে, যাতে ওই শহরগুলির শিল্প এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে জোয়ার আসে।

পর্যটন পরিকাঠামোকে উন্নত করতে ৫০টি কেন্দ্রকে প্রথম ধাপে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করা হবে। মুদ্রা লোন দেওয়া হবে হোমস্টে ব্যবসা বৃদ্ধি করে স্থানীয় মানুষের আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মূলত চারটি স্কিম আনছে— Export promotion mission, Bharat TradeNet, National Framework for GCC এবং Warehousing facility for AirCargo। প্রথম স্কিমে রপ্তানি করা কোম্পানিগুলির জন্য সহজে লোক দেওয়ার ব্যবস্থা, দ্বিতীয়টি একটি সাধারণ ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যা রপ্তানিকে আরও সুবিধা দিতে পারে। পণ্য বিপণন আরও সহজ হয়। তৃতীয়টি বিভিন্ন রাজ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরের পরিকাঠামো তৈরিতে সাহায্য এবং চতুর্থ স্কিম গুদাম বা হিমঘরের আন্তর্জাতিক স্তরের পরিকাঠামো তৈরিতে সাহায্য করার জন্য।

সরকার এই বছর মূলধনী খাতে ১০ শতাংশ বরাদ্দ বাড়িয়ে ১১,২১,০০০ কোটি খরচের প্রস্তাব রেখেছে। যার মধ্যে রেলে বরাদ্দ আড়াই লক্ষ কোটির বেশি। দেশের রেলব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়া এবং সুরক্ষা আরও নিশ্চিত করা এর মূল লক্ষ্য। সড়ক তো অবশ্যই অগ্রাধিকার। বিদ্যুৎ, জলপথ এবং বিমান পরিষেবার কথাতো আগেই বলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লক্ষ্য ভারতের পরিকাঠামো ব্যবস্থাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাতে আগামীদিনে বিদ্যুৎ থেকে ওষুধ কোনো ক্ষেত্রে আমরা কোনো দেশের কাছে এমনভাবে নির্ভরশীল না থাকি যাতে তারা আমাদের উপর ভূরাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন দেশের প্রান্তিকতম মানুষের নেতৃত্ব। তাঁদের আত্মনির্ভরতা। শেষ মানুষটি যেন মহাজনের কাছে হাত না পাতে বা নেতা ও বাবুদের কাছে মাথা না নোয়ায়। সবাই সমান অংশীদার হিসেবে দেশকে যেন এগিয়ে নিয়ে যায়। ■

এমএসএমই-সেক্টরের সংশোধিত শ্রেণীবিন্যাস

	লগ্নির পরিমাণ (কোটিতে)		টার্নওভার (কোটিতে)	
	চলতি	সংশোধিত	চলতি	সংশোধিত
ক্ষুদ্র উদ্যোগ	১	২.৫	৫	১০
ছোটো উদ্যোগ	১০	২৫	৫০	১০০
মাঝারি উদ্যোগ	৫০	১২৫	২৫০	৫০০

প্রণবধ্বনি ওঙ্কারই হলো শ্রীরাম

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সনাতন হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মলাভের সর্বোৎকৃষ্ট এবং যত উপায় আছে তার মধ্যে সর্বোত্তম উপায় হলো ওঙ্কার জপ। শ্বাসে প্রশ্বাসে এই ওঙ্কার মন্ত্র জপই সাধকের ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটায়।

এই ওঙ্কার রূপ অক্ষরই ব্রহ্মস্বরূপ, এই ওঙ্কারই পরব্রহ্ম স্বরূপ। এই ওঙ্কারই পরা ও অপরা ব্রহ্মের প্রতীক। এই ওঙ্কার উপাসনায় সাধক হন সর্বজ্ঞ। তাই শাস্ত্রে বলছে—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরৎ পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।।
(কঠোপনিষদ ১।২।১৬)

সনাতনী হিন্দু সব মন্ত্র উচ্চারণের আগে ও পরে ওঙ্কার উচ্চারণ করে মন্ত্রকে পুটিত করেন। কারণ সব মন্ত্র তখনই ফলদায়ী বা সিদ্ধ হয় যখন তা ওঙ্কার দ্বারা পুটিত হয়। ওঙ্কার ধ্বনি মন্ত্রের দোষ বিনষ্ট করে। ওঙ্কার পুটিত না হলে মন্ত্রে দোষ থেকে যায়। এমনকী ওঙ্কার, মন্ত্রোচ্চারণের দোষও খণ্ডিত করে। অ+উ+ম=ওম্। বেদে 'ম' স্থানে অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুও হয়। তাহলে ওঁ-এর উচ্চারণ বেদভিত্তিক করতে গেলে তা হবে ওম্।

অথর্বশির উপনিষদে আছে যা নারায়ণ উপনিষদেও পরিলক্ষিত হয় তাহলো ওঙ্কার স্বরূপ বর্ণনা। ওঙ্কার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে অথর্বশির ও নারায়ণ উপনিষদ মুক্তকণ্ঠে তার স্তুতি করে বলছেন এই ওঙ্কারই পরম ব্রহ্ম; ওঙ্কারই ব্রহ্ম। এই একাক্ষরী ওঙ্কার জপই সাধককে তার ইপ্সিত পূর্ণভূমার স্তরে স্থিতিলাভ ঘটাতে সক্ষম।

ওঁ প্রত্যাগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্।
ও-কার, উ-কার, ম-কার ইতি।
ওঁ সর্বভূতস্থং একং বৈ নারায়ণং কারণ পুরুষং
অ-কারণম্ পরং ব্রহ্ম ওম্।।
ও-মিতি ব্রহ্ম। ওমিতি ব্রহ্ম।।

অর্থাৎ জীবের এবং সর্বভূতের অন্তরে যে কারণ স্বরূপ নারায়ণ শায়িত আছেন তিনিই অকার-উকার-মকারাত্মক কারণ, তিনিই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তিনিই অন্তরলায়িত প্রত্যাগাত্মা, সর্বজীবের আশ্রয়। তিনিই একামাত্র, স্বয়ং। কারণেরও কারণ স্বরূপ অথচ কোনো কারণসম্ভূত তিনি নন। তিনিই আত্মা, তিনিই শিব, তিনিই নারায়ণ, তিনিই পরমব্রহ্ম ওঙ্কার, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই ওঙ্কার।

আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা কিছুদিন আগে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে; যা গুগলে সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে। যাতে দেখা যাচ্ছে বা শোনা যাচ্ছে; এই বিশ্বে বা মহাবিশ্বের অন্তঃস্থল থেকে একরকম ধ্বনি উদ্গীত হচ্ছে যা ওঙ্কার ধ্বনি স্বরূপ। প্রচলিত বিগ ব্যাং থিয়োরি, যা থেকে বিস্ফোরণ পরবর্তী কম্পনের সূত্রপাত, যা এই ত্রিমাত্রিক অথবা বহুমাত্রিক বা সমগ্র মাত্রিক বিশ্বসৃষ্টির মূল, যা কম্পন পরবর্তী শব্দশক্তি তা আর কিছুই নয়, তাই-ই হলো ওঙ্কারের টংকার স্বরূপ, তাই হলো বিস্ফোরণের কম্পন উদ্ভূত ওঙ্কার। এই মহাবিশ্ব হলো সেই কম্পনের, সেই শব্দ শক্তির। সেই শব্দ ব্রহ্মেরই ঘনীভূত রূপ।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁর স্কন্দপুরাণম্ গ্রন্থে ওঙ্কারের সৃষ্টি বা আবির্ভাব প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, স্বয়ং শিব পার্বতীকে বলছেন—

প্রাকৃতে কল্পসঞ্জেতু প্রথমে প্রথমং ময়া।

বক্ত্রাদুৎপাদিতো দেবী পুরুষঃ কপিলাকৃতিঃ।।

অর্থাৎ, আগে প্রাকৃতকল্পে আমার মুখ থেকে এক কপিলাকৃতি পুরুষের সৃষ্টি হয়। তাঁকে বলি তুমি তোমার নিজ আত্মাকে বিভক্ত করো। সে সাধনা শুরু করে, আমাতেই ধ্যানাবিষ্ট হয়। আমারই প্রসন্নতায় অখিললোক পরিব্যাপ্ত করে ত্রিবর্ণস্বর-রূপী, চতুর্বর্গফলপ্রদ ঋক-সাম-যজুঃ নামক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর স্বরূপ ওঙ্কার তাঁর ধ্যান- আবিষ্ট দেহ ভেদ করে প্রকাশিত হয়।

স্কন্দপুরাণের বর্ণনা এবং নাসার গবেষণা কোথাও কি মিলে যাচ্ছে!

এই একাক্ষরী ওঙ্কার শব্দটি সনাতনী হিন্দুর জীবনে যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তেমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শব্দটিও।

সনাতনী হিন্দুর জীবনে দ্ব্যক্ষর 'রাম' শব্দটি একটি গভীর মাহাত্ম্যপূর্ণ শব্দ। সনাতনী হিন্দু চিরকালে দায়ে-দৈবে, সর্বত্র, সর্বকালে, সর্বযুগে, জাতি-প্রদেশ নির্বিশেষে অন্তরের গভীর অন্তঃস্থল থেকে উৎসাহিত করেছে এই রাম শব্দটি। আজও আমরা দেখি দুজন সনাতনী হিন্দুর দেখা হলে পরস্পরকে 'রাম-রাম' বলে সম্ভাষণ করতে। আজও সনাতনী হিন্দু সংখ্যা গণনার সময় 'রাম'কে এক ধরে গণনা শুরু করে। নিজ সন্তানের নাম রাখে 'রাম'। বিপদে আপদে যে 'রাম' নাম জপে, রামায়ণ বা 'রামচরিত মানস' পাঠ করে। জীবনের প্রতিটা অধ্যায়ে সে জড়িত থাকতে চায় 'রাম' শব্দটির সঙ্গে। আসলে ব্যাপার হলো এই 'রাম' শব্দটিও আদতে ওঙ্কার। প্রাচীন ঋষিরা সর্বসাধারণে এই ওঙ্কার শব্দটি বহু গবেষণা করে চালিত করে দিয়েছেন যাতে সাধারণ মানুষ অজ্ঞাতসারেই আধ্যাত্মিক পথে চালিত হতে পারে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল সর্বজীবের উন্নতি, সর্বসুখ, সবার মিলন। তাই তারা বললেন,

যথৈব বটবীজস্থ প্রাকৃতশ্চ মহাদ্রুমঃ।

তথৈব রামমন্ত্রস্থ বিদ্যতে চরাচরং জগৎ।।

অর্থাৎ বটগাছ যেমন তার একটি ছোট্ট বীজের মধ্যে বিশাল এক মহীরুহকে সুপ্ত করে অবস্থায় রেখে দেয়, তেমনি রাম শব্দটির মধ্যেও সুপ্ত আছে এই বিশ্বচরাচর অর্থাৎ অ-উ-ম।

ঋষিরা বললেন 'রাম'-ই ওঙ্কার। ওঙ্কারই 'রাম'। তাঁরা শুধু বলেই ক্ষান্ত দিলেন না প্রমাণও করে দিলেন, রাম=ওঁ।

রাম শব্দটি বর্ণ বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখালেন—

রাম=র্+আ+ম্+অ

=র্+অ+ অ+ম্+অ

আমরা জানি স্বরবর্ণ মাত্রেই পুংলিঙ্গ অর্থাৎ স্বাধীন এবং ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্রেই স্ত্রী-লিঙ্গ অর্থাৎ পরাধীন। পাণিনিকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বিশ্লেষিত রাম শব্দের 'অ' সামনে চলে এলে 'রাম' শব্দের পুরো বর্ণ বিশ্লেষণটি দাঁড়াবে—

রাম=র্+আ+ম্+অ

=র্+অ+ অ+ম্+অ

=অ+র্+অ+ অ+ম্+অ

ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কোনো শব্দের র-বর্ণের পূর্বভাগে এবং উত্তরভাগে যদি অ-বর্ণ বসে তবে সেই র-বর্ণটি 'উ' বর্ণে পরিণত হয়। ফলে 'রাম' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে তার অন্ত্যভাগের র+অ=উ

∴ অ+র্+অ=উ হয়।

এবার উ+অ=ও এবং ও+ম=ওম বা ওঁ

∴ অ+উ+ম=ওঁ =ওম=রাম।

এভাবেই সনাতনী হিন্দু ব্যাকরণবিদ ঋষিরা প্রমাণ করে দিয়েছেন রাম এবং ওঙ্কার সমার্থক অর্থাৎ রাম-ই হলেন ওঙ্কার এবং ওঙ্কারই রাম। □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

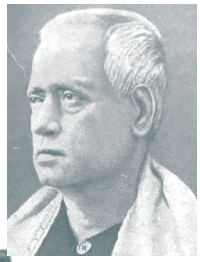

ওপার বঙ্গের শিক্ষানুরাগী ও দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

পূর্ববঙ্গের শিক্ষানুরাগী ও দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সারা পৃথিবীতে হিন্দুদের প্রেরণা পুরুষ। তাঁর অমর কীর্তি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। ১৮৫৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবেড়িয়ার বিটঘর গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং মা রামমালা দেবী একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও মহেশচন্দ্র ছিলেন স্বনির্মিত ও উদ্যমী পুরুষ। বহুগুণে গুণী ছিলেন তিনি। শিল্প, সাহিত্য, গবেষণা, ধর্ম, দর্শন, সমাজসেবা-সহ বিভিন্ন সামাজিক শাখায় তিনি বিচরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ত্যাগী ও নির্লোভ পুরুষ। অহংকার তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। নিতান্ত বালক বয়সে দারিদ্র্য জর্জরিত মহেশচন্দ্র যজমান বাড়িতে কিছু খাবার ও দক্ষিণা পেলে তা বিক্রি করে শহর থেকে খাতাপত্র, পেন্সিল ইত্যাদি কিনে এনে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে কিছু লাভ করতেন। লাভের অংশ দিয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি কিনতেন। তাতে তাঁর বিশ্বাস জন্মে যে, তিনি ব্যবসা করে ধনী হতে পারবেন।

গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে কুমিল্লা জেলা স্কুলে ভর্তি হয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই চিরদিনের জন্য পড়া ছেড়ে দিতে হয়। অর্থের খোঁজে মহানগর কলকাতায় চলে যান, একাধিক দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেন, দারিদ্র্যের যতরকম দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। কিন্তু হতাশ না হয়ে সংকল্পে অটল থেকে ২৪ বছরের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফলে সফল ব্যবসায়ীতে নিজেকে উন্নীত করতে সক্ষম হন।

ব্যবসা শুরু করেছিলেন কলকাতার ৮২ নং কলেজ স্ট্রিটে স্টেশনারি ও বইয়ের দোকান দিয়ে। পাশাপাশি পাইকারি কাগজও বিক্রি করতেন। কিন্তু একমাত্র লাভ দেখা গেল বই বিক্রিতে, সেটাকেই অবলম্বন করে বেঁচে থাকার সংগ্রামে হয়ে উঠেন নির্ভীক সৈনিক। পরিশ্রম ও চেষ্টা তাকে সফলতার উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। পরিণত বয়সে তিনি একজন সবল বাঙ্গালি ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধের ব্যবসা ছিল তাঁর। কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে ৮ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত মহেশাঙ্গন যা দুই বঙ্গের শান্তিনিকেতন হিসেবে পরিচিত। এই বিশাল অঙ্গনে রয়েছে ঈশ্বর পাঠশালা, রামমালা গ্রন্থাগার, রামমালা ছাত্রাবাস, নিবেদিতা ছাত্রী নিবাস, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, পুঁথি সংগ্রহশালা, নাটমন্দির, আয়ুর্বেদ ভেষজ গবেষণাগার, হোমিওপ্যাথ স্টোর, সংস্কৃত কলেজ ও ব্যায়ামাগার। এছাড়া আছে একটি পুকুর। একটি ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে সরকারি সাহায্য ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। গরিব রোগীর বিনা মূল্যে কিংবা কম মূল্যে তিনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন। রাজনীতির অনেক উর্ধ্বে ছিল এই দাতব্য প্রতিষ্ঠান। তবুও মাঝে মাঝে আক্রান্ত হতে হয়েছে তাকে বিনা কারণেই।

তিনি তার কর্মের পরিধি বাড়িয়ে ১৮৮৩ সালে কলকাতায় এসেছিলেন এবং সেখানে ১৮৮৯ সালে হোমিওপ্যাথি এবং অ্যালোপ্যাথি ওষুধ বিক্রি করার জন্য 'এম ভট্টাচার্য অ্যান্ড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশ বিদেশে অনেক শাখাও

ছিল কোম্পানির। জনহিত ও সমাজকল্যাণের জন্যও তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। পিতার স্মৃতিরক্ষায় তিনি ১৯১৪ সালে কুমিল্লা শহরে দরিদ্রদের জন্য ঈশ্বর পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বর পাঠশালা শিক্ষা ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া মায়ের স্মৃতিতে তিনি উনিশ শতকের প্রথমদিকে

কুমিল্লা শহরের শাকতলায় রামমালা পাঠাগার ও রামমালা ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করেছেন। একসময় গ্রন্থাগারটিকে অবিভক্ত ভারতের বাতিঘর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। নারী শিক্ষার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন নিবেদিতা গার্লস স্কুল ও নিবেদিতা গার্লস হোস্টেল। যা আজও গর্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়ে কুমিল্লায়। তিনি তার নিজ গ্রামে শিক্ষা সংসদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বারাণসীর কাশীধামে ঈশ্বর পাঠশালা টোলও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তীর্থযাত্রায় তিনি বৈদ্যনাথধামে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্য করেছেন অকৃপণ হাতে। সে সময়ে তিনি প্রতিদিন ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার পরিবেশন করেছেন বিনামূল্যে।

তিনি দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, অসুস্থ মানুষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে কত যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার হিসেব নেই। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, অভয় আশ্রম, ত্রিপুরা হিতৈষী পত্রিকার মুদ্রিত সংস্থা সিংহ প্রেস তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনী প্রমাণ করে অতিসূক্ষ্ম কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, সময়জ্ঞান এবং সংবেদনশীলতা কখনো তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। সম্পূর্ণ মানুষ তিনি হতে পেরেছিলেন বলেই ছাত্ররা যাতে মানবিক আদর্শে নিজেকে আদর্শায়িত করে জীবন গড়ে তুলতে পারে সে বিষয়ে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের সেভাবে নির্দেশ দিতেন। খুঁজে খুঁজে তিনি শিক্ষক নিয়োগ করতেন। রামমালা ছাত্রাবাসের মূল আদর্শ ছিল : 'সর্ব্বম আত্মবশং সুখম্ সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্' রামমালায় ছিল— ১. কৃষি বিভাগ, ২. সেবা বিভাগ, ৩. খাদ্য বিভাগ, ৪. মুদিদোকান, ৫. সভা-সমিতি, ৬. ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ, ৭. রামমালা পল্লীমঙ্গল সমিতি, ৮. ধর্মশিক্ষা। সকাল-বিকাল প্রার্থনা পরিচালিত হতো ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর ড. রাসমোহন চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে। এক সময়ে কুমিল্লার বরুড়ার সাহারপদুয়া গ্রামের বিশিষ্ট পণ্ডিত ভূষণ চক্রবর্তীও মহেশাঙ্গনে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ত্রিপুরার ধলাই জেলার কুলাই হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানবজীবন গড়ে তোলার জন্য জরুরি সব শিক্ষাই রামমালা ছাত্রাবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহেশচন্দ্র রামমালা ছাত্রাবাসকে নিজের মানসপুত্র বলে বিবেচনা করতেন। শুধু ছাত্রাবাসেই তাঁর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখেননি। অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। তার মধ্যে— ১. ঈশ্বর পাঠশালা টোল ও টোল বোর্ডিং, ২. ঈশ্বর পাঠশালা স্কুল ও রিচ হোস্টেল, ৩. রামমালা ছাত্রাবাস, ৪. রামমালা গ্রন্থাগার, ৫. রামমালা জাদুঘর, ৬. রামমালা রোড (রানির বাজার হতে শাকতলা পর্যন্ত), ৭. রামমালা পোস্ট অফিস, ৮. নিবেদিতা ছাত্রী নিবাস, ৯. নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, ১০. এম. ভট্টাচার্য্য অ্যান্ড কোং মহেশাঙ্গন, কুমিল্লা হোমিওপ্যাথ ওষুধের দোকান, ১১. বৈদিক ঔষধালয়, ১২. কাশী হরসুন্দরী ধর্মশালা, (কাশী, ইউপি ভারত), ১৩. ঈশ্বর পাঠশালা ব্যায়ামাগার, ১৪. মন্দির এবং ১৫. দুর্গা নাটমন্দির। আরও বিস্ময়কর হলো তাঁর চিন্তা-চেতনা আজকের বাংলাদেশে চিন্তা করাও কঠিন। তিনি কলকাতার ৮২নং কলেজ স্ট্রিটে একটি স্টেশনারি ও বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

বাংলা ১২৯৬, ইং ১৮৮৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালীকচ্ছ নিবাসী হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ শরৎচন্দ্র দত্তর পরামর্শে ৮১নং কলেজ স্ট্রিটে হোমিওপ্যাথিক স্টোর খোলেন। এবার তিনি সঠিক পথে উপনীত হন। তাঁর সততার গুণে অল্প সময়ের মধ্যে দোকানের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রশেখর কালী প্রমুখ তাঁকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সহযোগিতা করেন। মহেশচন্দ্র ব্যয়বহুল জার্মানির ফার্মাকোপিয়ার ফর্মূলা-সহ বিভিন্ন পুস্তক ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, অহমীয়, ওড়িয়া, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করিয়ে সস্তায় ছাপিয়ে ভারতব্যাপী গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের বিলি করতে থাকেন। তখন বাংলা ভাষায় হোমিওপ্যাথ চিকিৎসার ভালো কোনো গ্রন্থ নেই দেখে উপযুক্ত মানুষের সহায়তায় পারিবারিক চিকিৎসা গ্রন্থ নাম দিয়ে হোমিওপ্যাথির প্রচার করেন। এভাবে তিনি তৎকালীন ভারতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সুপরিচিত হন এবং প্রতিষ্ঠা পেতে থাকেন।

এরপর বাংলা ১২৯৯ ইং ১৮৯২ সালে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকানও খোলেন।

তাতেও তাঁর লাভ হতে থাকে। ক্রমে বাংলা ১৩০২ সালে ইং ১৮৯৫ ১১নং বনফিল্ড লেনে ক্ষুদ্রাকারে ইকোনোমিক ফার্মেসি খুলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মূল্য ৪ আনার স্থলে মাত্র ৫ পয়সায় বিক্রি করতে থাকেন। এতে করে মানুষের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা হয়। ক্রমে ঢাকা, কুমিল্লা, কাশী শহরে অনুরূপ দোকান খুলতে থাকেন। কাজেই বলা যায় যে, তিনিই হচ্ছেন ভারতে সস্তায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সংক্রান্ত ওষুধ বিস্তারের পথিকৃৎ। ওষুধ ব্যবসায় সাফল্যের পর মহেশচন্দ্র লৌহ সিন্দুক নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা-সহ কাঠ চেরাইয়ের জন্য করাত কল স্থাপন করেন। কিন্তু সৎ, অভিজ্ঞ ও কর্মঠ কর্মীর অভাবে লৌহ কারখানাটি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তিনি কুমিল্লায় একদরবিশিষ্ট কাপড়ের দোকানও খুলেছিলেন। এরপর শেষ ব্যবসা হিসেবে একদল সৎ ও অভিজ্ঞ কবিরাজের তত্ত্বাবধানে কুমিল্লায় আয়ুর্বেদীয় ওষুধ তৈরির ভেষজখানা স্থাপন করেন। সেখানে প্রস্তুতকৃত ওষুধ সমূহের বিক্রয়ার্থ দিয়ে বৈদিক ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যা এখনো মহেশাঙ্গনে বিদ্যমান। তাঁর ব্যবসায়ে বিপুল সাফল্য লাভের পেছনে তরুণকালে অর্জিত মহামূল্য বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সততা কাজ করেছিল।

কষ্টসহিষ্ণু এই ব্যবসায়ী যাঁর হওয়ার কথা শুধুই ব্যবসায়ী, তা না হয়ে জনকল্যাণে একদিন একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বাসস্থান, তাদের জ্ঞানপিপাসা পূরণকল্পে ব্যয়বহুল মহামূল্য গ্রন্থাদির সংগ্রহশালা এবং জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবেন তা অকল্পনীয় বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, রামমালা গ্রন্থাগারে তিনটি বিভাগ তিনি স্থাপন করেন— ১. গবেষণা বিভাগ, ২. সাধারণ বিভাগ, ৩. হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি বিভাগ। তিনি যে একজন খাঁটি স্বদেশী ছিলেন তার প্রমাণই হলো অগণিত পুঁথি সংগ্রহ। এই পুঁথিগুলো আজকে স্বদেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের খ্যাতিমান উচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতেও গবেষিত হচ্ছে। তার হাতেই ছড়িয়ে পড়ছে বঙ্গের লোকজ তথা প্রকৃত সংস্কৃতির ইতিহাস। পুঁথির এত বড়ো সংগ্রহ সম্ভবত উপমহাদেশে আর কোথাও নেই। রামমালায় এখনো দেশ-বিদেশের গবেষকরা তথ্য সংগ্রহ করতে আসেন। মহেশচন্দ্রের নীতিজ্ঞান এবং মিতব্যয়ী জীবনচর্যা এযুগের মানুষের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ। ব্যয়বহুল গাড়ির মালিক হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজন ছাড়া তা ব্যবহার করতেন না। মোটা সস্তা কাপড়ের ধুতি ও ফতুয়া ছিল নিত্যপরিধান। ব্যক্তিজীবনে এতই সৎ ছিলেন যে, দান করার সময় যাতে তাঁর নাম প্রকাশ না পায় বারবার তার অনুরোধ জানাতেন। ছবি তোলা ও প্রকাশ করারও ছিলেন তিনি ঘোরবিরোধী।

তিনি এতই সৎ ছিলেন যে একবার কীভাবে রেলযোগে তাঁর কোম্পানির মাল চলে এলে দেখা যায় তাতে মাশুল ছিল না, তিনি তৎক্ষণাৎ কর্মচারীকে ডেকে এনে দু'টাকার টিকিট কিনে ছিঁড়ে ফেলতে নির্দেশ দেন। সরকারি কর পরিশোধের দিকে ছিল তাঁর কড়া দৃষ্টি। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও রামমালা গ্রন্থাগারে তুলনামূলক ধর্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইহুদি, খ্রিস্টান, ইসলাম, পার্শি, কনফুশিয়ান, তাও, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থাদির বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন তিনি। তাছাড়া প্রাচীন যত দুর্লভ গ্রন্থাদি যথাসম্ভব সংগ্রহ করার চেষ্টা করে গেছেন। কুমিল্লার ব্রাহ্মাবলম্বীদের পত্রিকা 'ত্রিপুরা হিতৈষী' একবার বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর তাৎক্ষণিক আর্থিক সহযোগিতায় পুনরায় চালু হয়েছিল। সর্বদা আড়ালে থাকাই ছিল যাঁর স্বভাব নিজের জীবনবৃত্তান্ত লেখারও পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু একবার তাঁর পরিচয়ের মিথ্যা অপপ্রচার জানতে পেরে জীবনবৃত্তান্ত লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সর্বমোট চারটি গ্রন্থ লিখে রেখে গেছেন—. ব্যবসায়ী, ২. দানবিধি, ৩. ঋণবিধি এবং ৪. আত্মকথা।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর পাঠশালা ভারতভাগের আগে দীর্ঘ সোনালি যুগের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল প্রথম প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত জানকীনাথ সরকারের কল্যাণে। পাকিস্তান আমলেও এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছিল সর্বত্র। স্বাধীনতার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে দ্রুত এর ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে চলেছে। এই বিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্র দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। যেমন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. অম্লান দত্ত, কবি অমিয় চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী অজিত চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী বিমল কর, ব্যাকরণবিদ অধ্যাপক ড. হরলাল রায়, শিক্ষাবিদ অজিতকুমার গুহ, ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী কবি অনিল সরকার, নজরুলসঙ্গীতশিল্পী ও গবেষক সুধীন দাশ প্রমুখ। কর্মযোগী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহেশাঙ্গনের ইতিহাস দু'চার কথায় লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। কুমিল্লা মহেশাঙ্গনের ইতিহাস দুই বঙ্গের ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। □

ফঃ ৫

ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬ এবং ভারতীয় রেল

বিমলশঙ্কর নন্দ

২০১৬ সালের আগের কোনো একটি মার্চ মাসের কথা স্মরণে আনুন। সাধারণ বাজেট পেশের কয়েকদিন আগে পেশ হতো ভারতের রেল বাজেট। পেশ করতেন রেল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। গোটা ভারত জুড়ে আলোচনা শুরু হতো রেল বাজেটে কোন রাজ্যের লাভ বেশি হলো তা নিয়ে। কোন রাজ্য কটা নতুন ট্রেন পেল সেটা নিয়ে। রাজনীতির আগুনে গা গরম করা শুরু হতো। বিগত শতাব্দীর ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে আর একটি

কারণে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরার রাজনীতি সরগরম হতো কয়েকটা দিনের জন্য। প্রায় প্রতিটি রেল বাজেটে রেলের ভাড়া বাড়তো। এর প্রতিবাদে বামপন্থী দলগুলো এক দুদিন রেল অবরোধের ডাক দিতো। ভারতের অন্য রাজ্য এই ডাকে তেমন সাড়া না দিলেও বাম শাসিত ওপরের তিনটে রাজ্যে শাসক দলের মদতে এর বিপুল প্রভাব পড়তো। এক দুদিনের রেল অবরোধের জেরে হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হতো। তারপর নতুন ভাড়া চালু হয়ে যেতো, সবাই তাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতো। এ বছর পূজা শেষ হলে মানুষ যেমন পরের পূজার জন্য অপেক্ষা করে, এই 'বিপ্লবী'রাও অপেক্ষা করতো পরের রেল বাজেটের জন্য। তারপর আবার রেলকে নিয়ে আন্দোলন করা যাবে। কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো এর কেউই তোলেনি। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সরকারি পরিবহণ এই ভারতীয় রেল সঠিক পথে চলছিল কি? পশ্চিমের উন্নত দেশ এমনকী জাপান যে অত্যাধুনিক রেল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল আমরা তার ধারেকাছে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখেছিলাম কি? পরিকাঠামো উন্নয়ন কতটা গুরুত্ব পেত রেল বাজেটের রাজনীতির ঘোলাজলে হারিয়ে যেত এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো।

১৯৮৯ সালে ভারতে জোট রাজনীতির যুগ শুরু হওয়ার পর এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয় রেলকে ঘিরে। শুধু রেল নয়, গোটা অর্থনীতিই ঢুকে পড়ে জটিল রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে। তবে এই রাজনীতির সবচেয়ে বড়ো শিকার হয়েছিল ভারতীয় রেল। ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সময়কালে লালুপ্রসাদ যাদবের আমলে এবং ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জি রেলমন্ত্রী থাকার সময়ে রেলকে নিয়ে যে চটকদারি রাজনীতি শুরু হয় তার ফলে ভারতীয় রেলের অবস্থা হয় আইসিইউ-তে থাকা মরণাপন্ন রোগীর মতো। ২০১২ সালে রেল বাজেট পেশ করতে গিয়ে তৎকালীন রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী বলেছিলেন, 'ভারতীয় রেল একেবারে আইসিইউ-তে চলে গেছে। আমি একে সেখান থেকে টেনে বার করার চেষ্টা করছি।' দীনেশ ত্রিবেদী রেলমন্ত্রী হিসেবে ২০১২ সালের বাজেটে বেশ কিছু সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তৃণমূল সুপ্রিমোর সেটা পছন্দ হয়নি। ফলে দীনেশ ত্রিবেদীও রেলমন্ত্রী থাকতে পারেননি। ২০১৪ পর্যন্ত রেলে কোনোরকমের সংস্কার প্রক্রিয়া চালু করা সম্ভব হয়নি। এর আগে রেলমন্ত্রী হয়ে লালুপ্রসাদ যাদবও বলতেন তিনি মানুষের পকেট কেটে রেলের কোষাগার ভর্তি করতে চান না। রেলকে গরিব মানুষের জন্য সত্যিকারের একটি পরিবহণ ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে চান। সাধারণ মানুষের পকেট কাটার অভিযোগ কিন্তু আছে। এবং তার জন্য জেলের ঘানি সম্ভবত আবার অপেক্ষা করেছে লালু এবং তার পরিবারের জন্য। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির জেলের বেশ কয়েকবছর জেল খেটে বেরোনো লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, পুত্র তেজস্বী যাদব, ইতিমধ্যেই সিবিআই, ইডির তদন্তের আওতায় আছেন। অভিযোগ, জমির বদলে মানুষকে রেলের চাকরি পাইয়ে দেওয়া। অভিযোগ, ২০০৪ থেকে ২০০৯ সময়কালে লালু যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন জমির বিনিময়ে বেশ কয়েকজনকে রেলে গ্রুপ ডি পদে 'সাবস্টিটিউট' হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। পরে তাঁদের চাকরি স্থায়ী করে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই এই মামলায় লালু, রাবড়ি ছাড়াও আরও ১২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ হয়ে গেছে। তাদের জেলযাত্রা কেবল সময়ের অপেক্ষা। জনকল্যাণের নামে জনগণের পকেট কাটার কী চমৎকার উদাহরণ!

রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেট থেকে আলাদা করা হয়েছিল ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম অ্যাকওয়ার্থের নেতৃত্বে অ্যাকওয়ার্থ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অ্যাকওয়ার্থ কমিটি মনে করেছিল যে ভারতীয় রেলের পুনর্গঠনের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এবং তার জন্য রেলবাজেট আলাদা করে তৈরি করার প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা চলেছিল ৯২ বছর ধরে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার রেলকে ঘিরে গড়ে ওঠা রাজনীতির দুষ্টচক্র ভেঙে

ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। রেলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ভারতীয় রেলকে বিশ্বমানে উন্নীত করা, যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়গুলি যা এতদিন অবহেলিত ছিল সেগুলিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। ভারতীয় রেলকে তার বাজেট বরাদ্দের জন্য সাধারণ বাজেটের দিতে তাকিয়ে থাকতেই হয়। তাই আর্থিক সমন্বয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রেল বাজেটকে আবার সাধারণ বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৬ থেকে আবার ভারতের সাধারণ বাজেটের অঙ্গীভূত হয়েছে রেল বাজেট।

২০২৫-২৬ সালের বাজেটে ভারতীয় রেলের জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রায় আগের অর্থবর্ষের মতোই আছে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট ভারতীয় রেলের জন্য বরাদ্দ করেছে ২.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা এর মধ্যে গ্রস বাজেটারি সাপোর্ট হচ্ছে ২.৫২ লক্ষ কোটি টাকার মতো এবং বাজেট বহির্ভূত সূত্র থেকে আয় ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। মোট মূলধনী ব্যয় বাড়িয়ে করা হয়েছে ২.৬২ লক্ষ কোটি টাকা যা খরচ হবে আধুনিকীকরণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে।

২০২৫-২৬-এর বাজেটে ২০০টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন, ১০০টি অমৃত ভারত ট্রেন এবং ৫০টি নমো ভারত র‍্যাপিড ট্রেন আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে চালু করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নিম্ন ও মধ্য আয়ের যাত্রীদের সুবিধার্থে ১৭৫০০ নন-এসি কোচ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। রেলকে একটি নিরাপদ পরিবহণ হিসেবে গড়ে তুলতে অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ১.১৬ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের মধ্যেই রেলে ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

রেলের একটা বড়ো আয় হয় পণ্য পরিবহণের মাধ্যমে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শেষে ভারতীয় রেল ১.৬ বিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পণ্য পরিবহণকারী। পণ্যপরিবহণ ছাড়াও দ্রুত গতির ট্রেন চালিয়ে যাত্রীদের দেশের একস্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে ৭০০০ কিলোমিটার হাইস্পিড রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে যেখানে ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার বেগে যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো যাবে। রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে যে বিপুল বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার আর একটি লক্ষ্য হলো এর মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি। ১৪০ কোটি মানুষের দেশে এর প্রয়োজন অনেকখানি।

২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ঘোষণা করেছে। এটি হলো রাজনৈতিক লক্ষ্যে কোনো নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না। প্রকল্প গৃহীত হবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে। আগের যে প্রকল্পগুলির কাজ শুরু হয়েছে সেগুলো শেষ করার দিকে বেশি নজর দেওয়া হবে। ২০২৫-২৬ সালের বাজেট পেশ হওয়ার পর ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন আগামী ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে ৪.৬ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প শেষ করা হবে। এর মধ্যে আছে নতুন লাইন পাতা, সিঙ্গল লাইনকে ডবল লাইন করা, ব্যস্ত রুটে লাইনের সংখ্যা বাড়ানো, স্টেশন উন্নয়ন এবং পরিকাঠামোর অন্য দিকগুলিকে উন্নত করা। দেশকে উন্নত করতে গেলে সবার আগে তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে। আগামী ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার ১০০তম বর্ষে এক উন্নত ভারত গড়ে তোলার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে রেল হয়ে উঠবে তার অন্যতম মাধ্যম। বর্তমান বাজেটে রেলকে সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ভারতীয় রেলে যে পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বাজেটের মাধ্যমে তার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া। এ বছরের রেল বাজেটে উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য ১০,৪৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিপুল বরাদ্দ থেকেই বোঝা যায় ঠিক কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই অঞ্চলকে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন দিক জুড়ে রয়েছে চীন, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমানা। তাই কূটনৈতিক দিক থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগ বাড়ানো বর্তমান ভূ-রাজনীতির আবহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪ সালের পর থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে ১৮২৪ কিলোমিটার রেলপথ সম্প্রসারিত হয়েছে। তৈরি হয়েছে ৪৭৮টি নতুন ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস। ১১৮৯ কিলোমিটার রেলপথে সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে 'কবচ' স্থাপনের মাধ্যমে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ৯২টি স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশনে রূপান্তরিত করার কাজ চলছে। প্রসঙ্গত, ২০০৯ থেকে ২০১৪ সময়কালে অর্থাৎ ইউপিএ জমানায় উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য রেল বরাদ্দ ছিল ২১০০ কোটি টাকা। নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কেবল ২০২৫-২৬ সালের বাজেট বরাদ্দই হলো ১০,৪৪০ কোটি টাকা। এতেই বোঝা যায় বর্তমান সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতকে কতটা গুরুত্ব দেয়।

সবশেষে, ভারতীয় রেলের এক চমকপ্রদ সাফল্যের কথা বলে এই আলোচনা শেষ করবো। গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে আগামী ৩১ মার্চ চালু হতে চলেছে হাইড্রোজেন ট্রেন। কয়লা ইঞ্জিন থেকে ডিজেল ইঞ্জিন, তারপর ইলেকট্রিক ট্রেন হয়ে এবার ভারত পা রাখলো হাইড্রোজেন ট্রেনের যুগে। চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে এই হাইড্রোজেন ট্রেন। বিশ্বের গুটিকয় দেশ তৈরি করেছে হাইড্রোজেন ট্রেন। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো ৫০০ থেকে ৬০০ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিনের ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোজেন ট্রেন বানায়। ভারত সেখানে ১২০০ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন সম্পন্ন হাইড্রোজেন ট্রেন তৈরি করছে। দূষণহীন এই ট্রেন আগামীতে যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে। এর আগে কাশ্মীরে বিশ্বের উচ্চতম রেলব্রিজ বানিয়ে ভারতের প্রযুক্তিবিদরা বিশ্বের সমীহ আদায় করে নিয়েছেন। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির হাইড্রোজেন ট্রেন বিশ্বে ভারতকে এক অনন্য মর্যাদা দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আগামী ৩১ মার্চ চালু হতে চলেছে হাইড্রোজেন ট্রেন। কয়লা ইঞ্জিন থেকে ডিজেল ইঞ্জিন, তারপর ইলেকট্রিক ট্রেন হয়ে এবার ভারত পা রাখলো হাইড্রোজেন ট্রেনের যুগে।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত চর্চায় অবিভক্ত বঙ্গের পণ্ডিত সমাজ

বিজয় আঢ্য

ভারতীয় সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক। প্রকৃতিকে উন্নত করাই সংস্কৃতি। আহার আমাদের প্রকৃতি। অপরকে দিয়ে আহার সংস্কৃতি। এই আধ্যাত্মিক ভাবনা বেদে কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি — 'তত্ত্বমসি'। এই ভাবনার আলোকেই লেখক 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ও অবিভক্ত বঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাস ও পণ্ডিত সমাজ' (১ম খণ্ড) গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আর সংস্কৃত ভাষাই হলো ভারতীয় সংস্কৃতি তথা আধ্যাত্মিক ঐক্যানুভূতির প্রধানতম ভিত্তি। এই সংস্কৃত ভাষাপুষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতিই ভারতবর্ষের সকল মানুষকে স্বদেশপ্রেমে ও স্বজাত্যবোধে তথা স্বদেশাভিমানে উদ্বুদ্ধ করেছে। বস্তুত স্বদেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ তথা স্বদেশচর্চা সংস্কৃত ভাষার নিত্য অনুশীলন ছাড়া সম্ভব নয়। এই কারণেই বোধহয় লেখক সংস্কৃত ও অবিভক্ত বঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাস ও পণ্ডিত সমাজ লেখার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছেন। শুধু তাই নয়, ১০টি অধ্যায় ও ১৮টি পরিশিষ্ঠের সুদীর্ঘ পরিসরে (১ম খণ্ড ৬৮৮ পৃষ্ঠা) বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ করে আপন বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গ্রন্থটির সূচীপত্রের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হবে। বাঙ্গলার বৈদিক সংস্কৃতির সূচনা প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতসেবী 'দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের

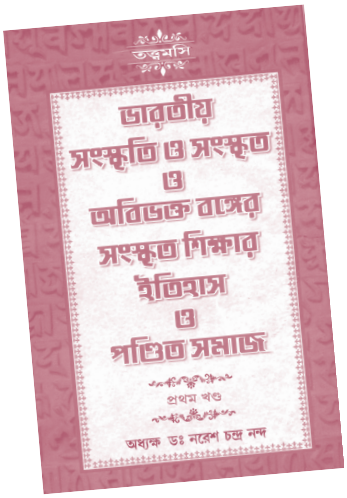

আগমন, মধ্যযুগে ইসলামিক শাসনে ও হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলে, স্বাধীনতা উত্তরকালে বিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত চর্চা ও প্রসারের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে চর্চা করেছেন। সেই সঙ্গে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এবং তৎপূর্বে অবিভক্ত বঙ্গের টোলশিক্ষা ব্যবস্থারও আলোচনা করেছেন। আধুনিককাল পর্যন্ত অবিভক্ত বঙ্গের ২১ জন বিশিষ্ট মহিলা পণ্ডিত, ১০৭৭ জন প্রখ্যাত টোল পণ্ডিত, সংস্কৃত অধ্যাপক, সংস্কৃতানুরাগী ও সংস্কৃতসেবী বিদ্বত পুরুষদের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশেষত মেদিনীপুর জেলার।

লেখক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত চর্চার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সেইসঙ্গে বঙ্গে ও বহির্বঙ্গে আদ্য, মধ্য ও উপাধি তথা তীর্থ পরীক্ষার জন্য সরকার অনুমোদিত ৪২টি বিষয়ের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (ভট্টাচার্য) প্রমুখ এবং নবদ্বীপের বঙ্গবিবুধজননী সভা, শান্তিপুরের বঙ্গীয় পুরাণ পরিষৎ ও ঢাকার পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানেরও বিষয় আলোচনা করেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ও তৎপূর্বে অবিভক্ত বঙ্গের টোল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা করেছেন। যেমন নবদ্বীপ, কাঁথি ও কোচবিহারের গভঃ সংস্কৃত কলেজের কথা বলেছেন। আর বিস্তারিতভাবে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারে লেখক নগেন্দ্রনাথ বক্সী, গজেন্দ্রনাথ কলা, ড. বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, বনবিহারী ভট্টাচার্য, ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নামোল্লেখ করেছেন। এই তালিকা এত দীর্ঘ যে এই স্বল্প পরিসরে তা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এছাড়াও মেদিনীপুর জেলার ১৬০ জন বিশিষ্ট মহিলা পণ্ডিতসহ ২১১৭ জন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত পণ্ডিতের কথা বলেছেন।

বস্তুত, সংস্কৃত ভাষার অমৃতস্পর্শেই

ভারতীয় প্রজ্ঞা ও মনীষার পূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। চার বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ, বুদ্ধচরিত, কালিদাস প্রমুখ মহাকবিদের কাব্যগ্রন্থ, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণসহ ১৪ প্রকারের ব্যাকরণ প্রভৃতি বিশ্বের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অতুলনীয় সম্পদসমূহ সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্বের অগ্রণী ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে সংস্কৃত ভাষার শব্দকোষে ১০৩০ কোটি শব্দ আছে। শুধু 'হাতি'রই ১০০টি সমার্থক শব্দ আছে। সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রায় ৬০০০০ তালপাতার পুঁথির উপর নাসা (ইউ এস এ) দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালাচ্ছে। প্রাপ্ত এক তথ্যের উল্লেখ করে লেখক জানিয়েছেন, বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশে ৪৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হয় এবং সর্বমোট ৩০ লক্ষেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতেও শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে ভারত সরকারের নিয়োজিত ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮-৪৯) থেকে ড: রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কমিটি (২০০৪) প্রভৃতি বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের ও বিশ্বের বহু মনীষী, ভাষাবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ সর্বজনীন শিক্ষাক্ষেত্রেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য দর্শনাদির চর্চার অত্যাবশ্যকতা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন।

অথচ ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাবে আমরা শিক্ষা তথা সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অস্বীকার করছি। ১৯৪৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর গণপরিষদে দ্বিতীয়বারে ভোটাভুটিতে মাত্র একটি ভোটের ব্যবধানের জন্য সংস্কৃতের পরিবর্তে হিন্দিকেই সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সংস্কৃতের প্রতি এই অবহেলা লেখকের সঙ্গে আমাদেরও বেদনাবিদ্ধ করে। লেখক ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন যে গত ৪২ বছর ধরে (১৯৭৭-২০১৯) পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সংস্কৃত শিক্ষাকে জোর করে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। আমাদের সমাজে মূল্যবোধের যে ক্ষয়িষ্ণুতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটা তার অন্যতম কারণ। তবে আশার কথা, সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সজ্জনবর্গ ও সংস্কৃত ভারতীর মতো সর্বভারতীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আজ সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা বলে প্রচারের যে ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ভাষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য নিয়মিত বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সাধারণ মানুষ যাতে সহজে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারে, ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, তার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। বিশেষত দেশের যুবসমাজ এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বয়োবৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ অধ্যাপকের এই গবেষণা গ্রন্থটি সেই প্রয়াস মসৃণ করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ও অবিভক্ত বঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাস ও পণ্ডিত সমাজ (১ম খণ্ড)
লেখক - অধ্যক্ষ ড. নরেশ চন্দ্র নন্দ
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা।
মূল্য : ৮০০ টাকা

With Best Compliments
From-

A
Well Wisher

ছাতু বামুনের স্বপ্ন

এক গ্রামে এক কৃপণ লোক ছিল। তার আর কেউ ছিল না। সে ভিক্ষায় বেরিয়ে লোকের বাড়িতে কেবলই ছাতু চাইত। লোকে তাকে আড়ালে ছাতু বামুন বলে ডাকত। আসলে ছাতুর প্রতি ছিল তার খুব লোভ।

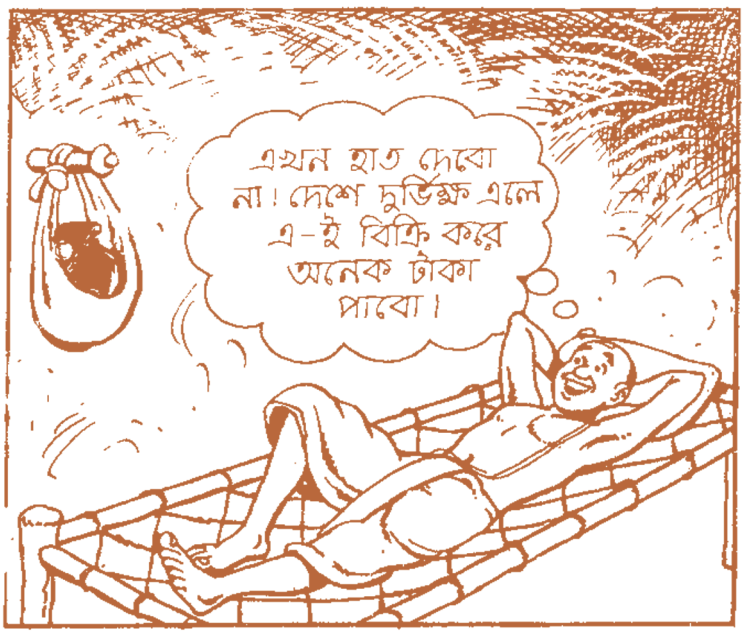

নিজে খেয়ে যেটুকু বাঁচত তা একটি হাঁড়িতে যত্ন করে রেখে হাঁড়িটা ঘরের চালার সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত।

প্রতিদিন একটু একটু করে ছাতু জমানোর ফলে হাঁড়ির মুখে আর সরা বসে না। ওই হাঁড়িটি তার বিছানার ঠিক ওপরে ঝোলানো থাকত। ছাতু বামুন বিছানায় শুয়ে শুয়ে পরম মমতায় একদৃষ্টে ওই হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকত। কেউ যদি ভেঙে ফেলে বা চুরি করে এই ছিল তার ভয়।

একদিন রাতে ছাতু বামুন শুয়ে শুয়ে ভাবছে, ভিক্ষা করে হাঁড়িটাকে তো ভরে ফেলেছি। এবার যদি দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহলে আমি সব ছাতু বিক্রি করে দেব। দুর্ভিক্ষের কারণে ছাতুর দামও বেশি পাবো। আমার ছাতুর দাম তো একশো টাকার মতো হবেই।

টাকার কথা ভাবতে ভাবতে ছাতু বামুনের ঘুম কোথায় চলে গেল। সে ভাবলো, ওই টাকা বাড়িতে রেখে কোনো লাভ নেই। বরং দুটো ছাগল কিনব। ওদের বাচ্চা হলে ছাগলের দুধ বেচেও পয়সা আসবে। কিছুদিন পরে অনেক ছাগল হবে। সেই সব ছাগল বিক্রি করে যখন অনেক টাকা হবে তখন কয়েকটা গাই কিনব। দুধ আর বাছুর বিক্রি করে অনেক টাকা হবে। তখন ওগুলো বিক্রি করে দিয়ে একটা মোষ কিনব। তারপর অনেক মোষ হবে। ওগুলো বিক্রি করে অনেকগুলো ঘোড়ার বাচ্চা কিনব। কিন্তু অতগুলো ঘোড়া সামলানো মুখের কথা নয়। বরং ঘোড়াগুলো বিক্রি করে সোনা কিনব। কম দামে সোনা কিনে বেশি দামে বিক্রি করে দেব। তাতে আমার প্রচুর লাভ হবে।

সোনার কথা ভাবতেই ছাতু বামুনের দেহে মনে যেন ফুর্তি এল। সোনা বেচার টাকা দিয়ে তখন বাড়ি কেনা তো সামান্য ব্যাপার। একটা বড়ো চক মেলানো বাড়ি হবে। উপরে নীচে অনেক ঘর। বারান্দা, দাস-দাসী, ঝি-চাকর চারদিকে ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করবে। বাড়ির মালিক বলে সবাই আমার খাতির করবে, আবার ভয়ও পাবে।

ছাতু বামুন শুয়ে শুয়ে ভাবে, আমার এত কিছু হবে আর একটা বউ না হলে কি মানায়? তখন দেখেশুনে একটা সুন্দরী বউ নিয়ে আসব। সে ঝম ঝম করে পায়ের মল বাজিয়ে সারা বাড়ি ঘুরবে। দাসী চাকরানিরা তার চুল বেঁধে দেবে, তাকে যত্নআত্তি করবে, সেবা করবে। গিন্নিমার ভয়ে সবাই তটস্থ থাকবে।

তারপর কিছুদিন পর তার কোল আলো করে আমার ছেলে জন্মাবে। রাজপুত্রের মতো দেখতে হবে আমার ছেলে। আমি তার নাম রাখব সোমশর্মা। কেমন সুন্দর নাম! সকলে অবাক হয়ে দেখবে আমার ছেলেকে।

সেই সময় আমি আয়েশ করে দিন কাটাব। কেননা আমার তখন টাকাকড়ির চিন্তা তো থাকছে না। পায়ের উপর পা তুলে শুধু আরাম করে দিন কাটাব আর আমার ছেলের দুষ্টুমি দেখব। সোমশর্মা একটু একটু করে বড়ো হবে। হামাগুড়ি দিতে শিখবে।

কখনো সে যদি ঘোড়াশালের দিকে চলে যায়, আমি রেগে গিয়ে চাকরদের ডাকাডাকি করব। তারা যদি শুনতে না পায় অথবা দৌড়ে না আসে, তাহলে সবকটাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেব। আর তখনো যদি কেউ কথা না শোনে তখন মারব এক —

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে দেখতে ছাতু বামুন এমন জোরে একটা লাথি ছুড়ল। ব্যস্, অমনি শিকেয় ঝোলানো ছাতুর হাঁড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আর রাশি রাশি ছাতু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক বিশ্রি কাণ্ড। ছাতু লেগে বামুনের সারা শরীর হয়ে গেল একেবারে সাদা। হতভম্ব হয়ে ছাতু বামুন শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তার জেগে জেগে দেখা স্বপ্নও নিমেষে চুরমার হয়ে গেল।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

কেইবুল লামজাও

কেইবুল লামজাও ন্যাশনাল পার্ক পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান জাতীয় উদ্যান। মণিপুর রাজ্যের বিষ্ণুপুর লোকটাক হ্রদে অবস্থিত। ১৯৭৭ সালে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পায়। ৪০ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি জায়গা নিয়ে বিস্তৃত এই উদ্যান। উদ্যানের চারপাশ তিনটি পাহাড় দ্বারা ঘেরা রয়েছে। বর্ষাকালে সব জন্তুজানোয়ার পাহাড়ের ওপর উঠে যায়। বিপন্ন পশু-পাখি এবং গাছপালা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উদ্যানটি করা হয়েছে। এই উদ্যানের আকর্ষণ হলো মণিপুরের সাঙ্গাই হরিণ। রয়েছে ৪২৫ প্রজাতির জীবজন্তু, ১০০ প্রজাতির পাখি এবং ২৩৩ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৫৫

নপুংসকলিঙ্গম

এতত – এতানি (এটি-- এগুলি)

এতত কিম ? – এতানি কানি ? (এটি কী ?– এগুলি কী ?)

এতত চিত্রম – এতানি চিত্রাণি (এটি চিত্র– এগুলি চিত্র)

অভ্যাস কুর্মঃ --

এতত পুস্তকম্ – এতানি পুস্তকানি।

এতত গৃহম্ – এতানি গৃহাণি।

এতত কঙ্কতম্ – এতানি কঙ্কতানি.

এতত ভবনম্ – এতানি ভবনানি।

এতত পুষ্পম্ – এতানি পুষ্পানি।

এতত মন্দিরম্ --এতানি মন্দিরাণি।

প্রযোগ কুর্মঃ –

(বাক্যম্, পদম্, ছত্রম্, মিত্রম্, যন্ত্রম্, ফেনকম্, যানম্, ফলম্,সস্যম্.ব্যঞ্জনম্, বস্ত্রম্, আভূষণম্, কার্যম্)

ভালো কথা

হাতে খড়ি

আমার ভাইয়ের এবার সাড়ে তিন বছর বয়স হলো। ঠাকুরদা আনেক আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন এবার সরস্বতীপূজার দিন ভাইয়ের হাতে খড়ি হবে। সেই মতো এবার সরস্বতীপূজার দিন ঠাকুরমশাই পূজার এক ফাঁকে ভাইয়ের হাতে খড়ি দিলেন। ভাইয়ের মতো আরও চারজনের হাতে খড়ি হলো। ঠাকুরমশাই শ্লেটের উপর ওদের হাতে ধরা খড়ি ধরে একে একে অ আ লিখে দিলেন। অভিভাবকদের বলে দিলেন প্রতিদিন বড়ো কেউ শ্লেটের উপর অ আ ই ঈ লিখে দিতে হবে আর ওদের তার উপর খড়ি দিয়ে হাত ঘোরাতে হবে। পরদিন সকালে মা শ্লেটের উপর অ লিখে ভাইকে হাত ঘোরানো শিখিয়ে দিলেন। ভাই তার উপর একমনে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে অ-টাকে গোল করে ফেলল।

শিবানী দাস, সপ্তম শ্রেণী, রানিবাঁধ, বাঁকুড়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শীতের কষ্ট

হারাধন রায়, নবম শ্রেণী, বৈষ্ণবনগর, মালদা

কষ্টের দিন বিদায় নিল
আমার মন ভালো হলো
গরমের দিন এসে গেল।
আমার কিছু নেইতো সম্বল
ছেঁড়া কাঁথা ছেঁড়া কম্বল
এ নিয়েই শীত কেটে গেল।

মিষ্টি রোদের আসছে গরম
গরমকালই বন্ধু পরম
শীত যেন আমার কাল।
শীত যেন না আসে ভাই
পাই যে কষ্ট যাচ্ছেতাই
উঠতে বসতে দিই যে গাল।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

খেলনার বাজারে ভারতের কৌশল

খেলা কখনোই ছেলেখেলা নয়

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমাদের পূর্ব বর্ধমানের অগ্রদ্বীপ গ্রামের একজন যদি Davosman হয়। ঠিকই বলছি, Davosman, যে শব্দবন্ধটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন ২০০৪ সাল নাগাদ সূচনা করলেন। এর আসল অর্থ কোটিপতি বহুজাতিক সংস্থার মালিক। প্রথম প্রথম সারা বিশ্ব ভাবত Davosman কেবলমাত্ররই আমেরিকা, ব্রিটেন বা এইরকম মস্তো ধনী

দেশের থেকেই তৈরি হয়। এখন পৃথিবী দেখছে Davosman ভারতে তৈরি হচ্ছে। বা বিশ্বের Davosman-রা ভারতের দিকে তাকিয়ে। বিকশিত ভারত কি আর খেলার ছলে হচ্ছে! হচ্ছে তো। খেলার ছলেও বিকশিত ভারত তৈরি হচ্ছে। খেলনা পুতুলঘরে ভারত যে ভাবে বিশ্ববাণিজ্যে স্থান করছে, আমদানি কমিয়ে নিজের পুতুল নিজেই গড়ছে, তা যে পুতুল তৈরির ঘরে চীনের Davosman-কে গুটির মতো তুড়ি মেরে সরিয়ে এদেশেরই Davosman তৈরি করবে না তা কে বলতে পারে! ২০২৫ কেন্দ্রীয় বাজেট অধিবেশনে শোনা গেল ভারতে খেলনা তৈরির ক্লাসটারের কথা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, Global toy Hub হবে ভারত। খেলনা তৈরির আন্তর্জাতিক ভরকেন্দ্র হবে ভারত। তার জন্য এক ছাতার নীচে আনা হবে কারিগরি প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উদ্ভাবনী শক্তি এবং অতি অবশ্যই আধুনিকতা। মেক ইন ইন্ডিয়া— চলার একটা চাবি থাকবে খেলনার ঘরে। পূর্ব বর্ধমানের অগ্রদ্বীপ গ্রাম খেলনা তৈরির জন্য পরিচিত। সেই পরিচিত শব্দ যদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে প্রসিদ্ধ হয়, যদি ওখান থেকেই খেলনা তৈরির তথাকথিত Davosman তৈরি হয় তখন যে তা আর খেলা-খেলা বিষয় থাকবে না। আমাদের দেশে খেলনা তৈরির ক্লাসটার ২০১৫ থেকেই শুরু। কর্ণাটকের কোপ্পাল টয় ক্লাসটার এবং গ্রেটার নয়ডা টয় ক্লাব যথেষ্ট পরিচিত নাম। খেলনাতো এখন কেবলমাত্রই খেলনা নয়। বুদ্ধিমত্তা গঠন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তৈরি, লেখাপড়ার একঘেয়েমিতে খেলার ছলে পড়ানো ইত্যাদি নানান ব্রেন ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়ায় চনমনে আধুনিক খেলনার কদর ক্রমশ বাড়ছে। সারা বিশ্বেই বাড়ছে অবশ্য।

লক্ষ্য করার মতো, ২০১৪-২০২০-র মধ্যে ভারতে খেলনার বেশ নামকরা স্টার্ট আপের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১০ হাজার কোটি করপাস অ্যাকাউন্ট। ফলে তাও পরোক্ষভাবে খেলনা স্টার্ট আপে দম দেবে। ভারতকে বিকশিত হতে খেলনার সঙ্গে ভাব জমাতেই হবে। কারণ Markets and Research-এর তথ্যানুসারে আগামী ২০৩২-এর মধ্যে ভারতের খেলনা বাজার ৪.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অঙ্ক ছুঁতে চলেছে যা ২০২৩-এ ছিল ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মেড ইন ইন্ডিয়া— একটা ব্র্যান্ড। বাকি আর কিছুই দেখার আগ্রহ নেই। বাজেটে পুতুল খেলার আয়োজনে যেভাবে মেড ইন ইন্ডিয়ার ঘোড়ায় দম দেওয়া হলো সত্যিই বিশুদ্ধ ছক্কা।

আমাদের দেশে এবং সারা বিশ্বেই 'meaningful play time', 'conscious parenting' এখন এক অতি পরিচিত শব্দ যা খেলনার চাহিদায় গুরুত্বে পুরনো সব ছক ভেঙেছে। খেলনা হয়ে উঠছে problem-solving skill. STEM এডুকেশন এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় শিশু বিকাশ চর্চা। McDonald's-এর মতো বহুজাতিক সংস্থা ঠিক সেই সুযোগ নিল। তারা বাচ্চাদের মিল

ফঃ ৬

বক্সে প্রমোশনাল টয় জুড়তে শুরু করে। Pepsi Lay's খেলনা বাজারে ধরতে বিনামূল্যে TAZO দিতে শুরু করল। অর্থাৎ খেলনার বাজার কিন্তু খেলনা ফেলনা নয়। ভারত যদি এই বাজার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যথাযথ ভাবে ধরতে পারে তবে তা খেলনা পরীক্ষায় বড়ো জয় আনবে। কারিগর শিল্পী সবাই যেহেতু এক ছাতার তলায় তাই আগামীর ভারতীয় খেলনা উদ্যোগপতি ছাপিয়ে যেতে পারে আমেরিকার Simba Dickie কিংবা Mettel Inc-কে। Mettel Inc যাকে সবাই জানলাম বারবি পুতুল তৈরির জন্য। সেই স্থান কাল যে ভারতের থিরুকান্নুর কাগজমণ্ড নাচ পুতুল পাবে না তা কি বলা যায়? তাদের যে শৈল্পিক দক্ষতা আবেদন একাগ্রতা এক একটা পুতুল তৈরিতে জমা হয় তা বারবিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে।

বহুজাতিক সংস্থার আওতায় যদি ভারতের স্থানীয় এইসব খেলনাকে আনা যায় তবে তা সত্যিই বিশ্বের খেলনা তৈরির রাজা হবে। প্রতি বছর ভারতের খেলনার বাজার ১২ শতাংশ হারে বেড়ে ২০২৭-এ ২.৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। একি ছেলেখেলা নাকি? এখনও পর্যন্ত আনুমানিক ৪০০০ খেলনা ইউনিট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আওতায় আছে। বহুজাতিক সংস্থার মালিক হতে হয়তো একটু সময় লাগবে, কিন্তু চীনের খেলনা বাজারে যে সাপলুডো শুরু হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখনো পর্যন্ত ভারতের মোট খেলনা তৈরির ৯০ শতাংশই অসংগঠিত খাতের। তাতেই চীনা পুতুল খেলনার আমদানি ২০২১-২২-এ হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১০৯.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৪-১৫-তেও ছিল ৩৩২.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে অর্থবর্ষ '২২-এ ভারতের খেলনা রপ্তানির অঙ্ক ৩২৬.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা '১৫ অর্থবর্ষে ছিল ৯৬.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার! মেক ইন ইন্ডিয়া তো আর স্বপ্নের খেলাঘর নয়, এ এক বাজির খেলা। বিশ্ব বাজারে যখন খেলনার চাহিদা ৫ শতাংশ বেড়েছে তখন ভারতের নিজের ঘরে সেই হার ১৫ শতাংশ হারে ঊর্ধমুখী। হঠাৎ যে আজকেই খেলনার জন্য এমন সিদ্ধান্ত ভারত সরকারের তা নয় কিন্তু। ২০২৩-এও ৩৫০০ কোটি টাকার Production linked incentive (PLI)-এর ঘোষণা করে ভারত সরকার। যেখানে খেলনা হয়ে উঠুক অর্থনৈতিক ভাবে জীবন্ত।

খেলনার বাজারে চীনের বড্ড দেমাগ। বিশ্বের মোট খেলনার ৮০ শতাংশই ওরা রপ্তানি করে। ভারত সেই খেলা বদলাতে শুরু করল ২০২০ থেকেই। আমদানি শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-এ হলো ৭০ শতাংশ। Quality Control Order পরীক্ষা হয়ে উঠল প্রথম উদ্দেশ্য। সারা বিশ্ব দেখল সে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বাণিজ্যিক খেলা। অর্থবর্ষ ২০-তে আমদানি ছিল ২৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা অর্থবর্ষ ২৪-এ গুটি বদলে নেমে আসল ৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে! পুরো গেম চেঞ্জার যে ভারত! আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনরায় প্রেসিডেন্ট হতে বিশ্বের Davosman-রা খুব চিন্তিত। কত যে আমদানি শুল্ক করবে প্রেসিডেন্ট স্যার কে জানে! সেই খেলা খেলনার বাজারে কোভিড সময়কাল থেকেই ভারত করেছে। ভারত কি আর এমনি এমনি এই সিদ্ধান্ত নিল? খেলার মতো বড়ো অঙ্ক কম হয়। খেলনা সেই অঙ্কের রাফ বুক। হিসেব বলছে, বিশ্বের কিশোরের এক চতুর্থাংশ এই মুহূর্তে ভারতে। তাই মেড ইন ইন্ডিয়ার মতো যথাযথ খেলা আর কিছুই নেই এখন। দরকার আরও কিছুটা আধুনিকতা। চীনের কাছে ভারত ইলেকট্রনিক খেলনাতে পিছিয়ে। এই খেলনার আন্তর্জাতিক ভাবে মোট পুতুল বাজারের অঙ্ক ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতের লক্ষ্য এই বাজারকে ধরা। যার জন্য প্রযুক্তি কৌশল এবং খেলনা কারিগরি সবগুলোই এক ছাতার তলায় আনা দরকার। এই বাস্তুতন্ত্র তৈরির লক্ষ্যে খেলনা বলছে মাভৈঃ। গ্লোবাল পার্টনারশিপ, হাইটেক টয়, এবং কালচারাল হেরিটেজ— এই তিন মাথা এক করার লক্ষ্যে ভারত এগোচ্ছে।

বিষয়টা খেলনা তাই আমরা তেমন পড়ার ছলে ভাবি না। খেলার ছলেই দেখি। চীনা পুতুলের আমদানি ভাঙতে পারলে ভারতের আনুমানিক ১.১ লক্ষ কোটি কাটারও বেশি অর্থনৈতিক লাভ হবে। তার সঙ্গে কর্ম সংস্থান হবে আনুমানিক ২২ লক্ষ। জাতীয় রাজস্ব আসবে আনুমানিক ৪০০ কোটি। মনে রাখতে হবে, ২০২২-২৩-এ ভারতের খেলনা রপ্তানি ২০১৪-১৫-র তুলনায় ২৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তাই খেলনার খেলা অর্থনৈতিক ভাবে ভারতকে পাকা খেলোয়াড় বানাতেই পারে। এ এক সম্ভাবনার আয়োজন। খেলনা কেবলমাত্রই খেলনা নয়। জিও-পলিটিকাল চালে সেও খেলে। খেলে বলেই আমেরিকার উঁচু মানের খেলনা প্রস্তুতকারক সংস্থা 'Toys RUS' ২০২৩-এর মাঝামাঝি থেকে তাদের প্রস্তুত ইউনিট ভারতে করে। চীনের সঙ্গে খেলব না বলে আড়ি করেই করে এই উৎপাদন ইউনিটটি। চীনে এই সংস্থার অনেক দোকান ছিল, তৈরিও হলো, কিন্তু নতুন উৎপাদন ইউনিটটি ভারতেই। অবশ্যই তা ভারতের মডেল বা ডিজাইন খেলনা হলো না কিন্তু যেই না চীনের খেলনাতে ভারত চড়া শুল্ক গুনল, নিজের খেলনায় দম দিল— অমনি আমেরিকার আগ্রহ তৈরি হলো ভারতের মাটিতে। অর্থাৎ খেলনার ঘরে সব কিছুই নিছক নয়। ছক ভাঙারও কাজ করে খেলনা।

ভারত যে খেলনাতেও শিক্ষা দিচ্ছে তা আমেরিকার উল্লিখিত পদক্ষেপে প্রমাণিত। আমেরিকার Davosman যদি খেলনাতেও টাট্টু ঘোড়া ছুটিয়ে ভারতের দিকে আসে, তবে তো খেলনাতে ভারতীয় Davosman তৈরি সময়ের অপেক্ষা মাত্র। Davosman-এর প্রথম কাজ সীমান্তহীন দেশ পৃথিবীর বাণিজ্য। একমাত্র খেলনাই যা সীমান্তহীন প্রয়োজন অপেক্ষা আহ্বান করে। খেলনা নিয়েও যেন Davosman, নয় কি? পৃথিবীর অমুক দেশের ফল তমুক দেশে নাও যেতে পারে। ইতালির জামায় আমাকে নাও মানাতে পারে। ওই সুদুর ল্যাটিন আমেরিকার মেয়েটা শাড়ি নাও পরতে পারে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী শৈশব কৈশোর খেলা খেলনার কোনো ভেদাভেদ রীতি ধর্ম আমার নিয়ম— তোমার আদব কিছুই হয় না। খেলনা এক শাশ্বত আনন্দের ভাষা। যেমন হাসি— সবার জন্য এক মানে ধরে। খেলনা তাই প্রকৃত Davosman, আর সেই বাণিজ্য যে আয়ত্তে আনবে সে আরও বড়ো Davosman! ভারত খেলনা প্রস্তুত ও উদ্ভাবনী কৌশলে নতুন খেলা দেখাবেই।

কুম্ভমেলায় পদপিষ্টের ঘটনা এবারই প্রথম নয়

দুর্গাপদ ঘোষ

প্রয়াগরাজ : গত ২৯ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যার দিন প্রয়াগের মহাকুম্ভ মেলা প্রাঙ্গণে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজনের হতাহত হবার ঘটনা সবাইকে বিচলিত করেছে। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের (৫ ফেব্রুয়ারি) মুখে এই ঘটনায় রাজনীতির প্রাঙ্গণও রীতিমতো তপ্ত হয়ে ওঠে। কেন্দ্রে মোদী এবং উত্তরপ্রদেশে যোগী প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনার ত্রুটি নিয়ে মুখিয়ে ওঠেন তাবৎ বিজেপি বিরোধীরা। বলাবাহুল্য, মহাকুম্ভের এই বিপর্যয় খুবই দুঃখজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু কুম্ভমেলায় এ ধরনের বিপর্যয় এটাই প্রথম নয়। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর এর আগে আরও অন্তত ৪টি পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে একটি ঘটেছে রাজনৈতিক নেতাদের কারণে।

কুম্ভমেলায় পদপিষ্টে হতাহতের ঘটনা প্রথম ঘটে ১৯৫৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। সেদিনও মৌনী অমাবস্যা ছিল। পুণ্যস্নানের জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়েছিল ত্রিবেণী সঙ্গমে। হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কির ফলে জলে ডুবে এবং পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় ৮০০ জন পুণ্যার্থী। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন প্রায় ৩০০ জন।

দ্বিতীয় পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে ১৯৮৬ সালে। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায়। ওই ঘটনায় জীবন চলে যায় কমপক্ষে ২০০ পুণ্যার্থীর। সেবার আনুমানিক ১ কোটির মতো পুণ্যার্থী সমাগম হয়েছিল সবদিন মিলিয়ে। ঘটনার বিবরণ থেকে জানা গেছে যে সেবার বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রভাবশালী রাজনীতিকদের অনেকে কুম্ভস্নান করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সামাল দিতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা সাধারণ পুণ্যার্থীদের বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখার ফলে ভিড়ের চাপ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। ভিআইপি, ভিভিআইপি-দের নিরাপত্তা রক্ষা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষদের ভিড় চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তার ফলে সমস্ত ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গিয়ে ওই ভয়াবহ ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

পদপিষ্ট ও হতাহতের তৃতীয় ঘটনা ঘটে নাসিকের কুম্ভমেলায় ২০০৩ সালে। কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী গোদাবরী নদীতে স্নান করতে গিয়ে পিছন থেকে ভিড়ের চাপে ধাক্কা খান। সামলাতে না পেরে অনেকে মুখ থুবড়ে পড়ে যান আর তাঁদের দেহের উপরে চলে আসেন অনেকে। ওই পদপিষ্টের ঘটনায়

পরলোকে রানা বিশ্বাস

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক রানা বিশ্বাস গত ৮ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। তিনি রেখে গেছেন তাঁর সহধর্মিণী ও একমাত্র কন্যাকে। তিনি বাল্যকালে কলকাতা কাঁকুড়গাছি শাখায় স্বয়ংসেবক হন। গত শতাব্দীর শেষলগ্নে বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্বে আসেন। পরিষদের কলকাতা শাখার সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন। কর্মজীবনের শেষে পুরুলিয়া জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকের পদে বৃত ছিলেন।

সেবার ৩৯ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু ঘটে। আহত হন ১০০ জনেরও বেশি। নাসিকের ওই কুম্ভমেলায় সব মিলিয়ে পুণ্যস্নার্থীর আগমন ঘটেছিল প্রায় ৭ কোটির মতো।

চতুর্থ ঘটনাও ঘটে প্রয়াগরাজে। তবে সেবারের বিপর্যয় ত্রিবেণী সঙ্গমে কিংবা কুম্ভমেলা প্রাঙ্গণে ঘটেনি। ঘটেছিল এলাহাবাদ (এখন প্রয়াগরাজ) রেল স্টেশনে। কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে আগত পুণ্যার্থীদের চাপে ২০১৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি স্টেশনে একটি ফুটব্রিজ ভেঙে পড়ে। শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি, ধাক্কাধাক্কি। তাতে পদপিষ্ট হয়ে নিহত হন ৪২ জন। ৪৫ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সেবার প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায় সব মিলিয়ে ১২ কোটির মতো পুণ্যার্থী সমাগম হয়েছিল।

এবার অর্থাৎ পঞ্চম পদপিষ্ঠে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে মেলা পরিসরে, মাঝরাত্রে। এদিন অমৃত স্নান শুরু হবার কথা ছিল ভোর ৫.১৫ মিনিটে। নাগাদের মহানির্বাণী আখড়া শাহী স্নান করার পর বাকি সবাই স্নান করবেন— অনেক আগে থেকে এটাই নির্ধারিত ছিল। কিন্তু রাত দেড়টা-দুটোর মধ্যেই প্রায় ৩ কোটি পুণ্যার্থীর আগমন ঘটে এবং সবাই তখনই স্নান করতে সঙ্গম স্থলের কাছে চলে আসেন। রাত ২টো নাগাদ বেড়ে যায় প্রবল ভিড়ের চাপ। এতটাই যে মুহূর্তের মধ্যে ব্যারিকেড ভেঙে যায়। তার ফলে বেশ কয়েকজন মাটিতে পড়ে যান। এসব ক্ষেত্রে এবং এরকম পরিস্থিতিতে যা অবধারিত তাই ঘটে যায়। মুহূর্তে এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় কিছুটা দূরে, এমনকী রাস্তার ওপরে যাঁরা শুয়ে-বসে ছিলেন তাঁদের উপরেও আছড়ে পড়েন অসংখ্য মানুষ। এহেন বিপর্যয়ে অন্তত ৩০ জনের প্রাণ বিসর্জিত হয়। মোট ৯০ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৩৬ জনের অবস্থা গুরুতর দেখে ভর্তি করে নিয়ে চিকিৎসা চালানো হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, মহাকুম্ভমেলা কেবল মৌনী অমাবস্যার দিনই ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ কুম্ভযাত্রী পুণ্যস্নান করেছেন। আরও উল্লেখযোগ্য, ভিআইপি-দের জন্য এদিন কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়নি। কোনো 'বিশিষ্ট' ব্যক্তিকে এরকম কোনো পাশেও দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র পুণ্যার্থী আগমনের ফলে শুধু ৪ মাসের জন্য গঠিত গোটা মহাকুম্ভমেলা জেলায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি রাজ্যের বাইরের থেকে মোট প্রায় ২০ কোটি মানুষের উপস্থিতি ঘটে উত্তর প্রদেশে যা এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরও বেশি। অনুমান করা হচ্ছে, সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ কোটি শ্রদ্ধালু পুণ্যস্নান করবেন এবারের মহাকুম্ভে। পুণ্যার্থীদের এরকম প্রবল চাপ সামাল দেওয়া মেলা কর্তৃপক্ষ তথা রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না।

উল্লেখ্য, মৌনী অমাবস্যার দিন পদপিষ্ট হয়ে হতাহতের ঘটনার পাশাপাশি অনেকে তাঁদের পরিবার পরিজনের থেকে ছিটকে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। প্রতিটি কুম্ভমেলাতেই, কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই অনেকে হারিয়ে যান। কিন্তু এবারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, 'ভুলে ভটকে' বা হারিয়ে যাওয়া মানুষদের জন্য এবার যে শিবির করা হয়েছিল তার স্বেচ্ছাসেবকরা হারানো ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলন ঘটানোর কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন।

কেবল ১৯ জানুয়ারি অর্থাৎ পদপিষ্টের ঘটনার দিনই তাঁরা ৩৫০ জন পুরুষ, ২৪০ জন মহিলা এবং প্রায় ২০টি শিশু মিলে মোট ৬০০ জনের বেশি হারিয়ে যাওয়াদের খুঁজে বার করে তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেন। এঁদের নিয়ে ওইদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭ দিনের মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৫০০ জন হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটিয়েছে এই শিবির। □

শোক সংবাদ

ন্যাশনালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ শাখার রাজ্য সভাপতি অমিত চক্রবর্তীর মাতৃদেবী কল্যাণী চক্রবর্তী গত ৩১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছন।

* * *

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা নগরের চণ্ডীতলার স্বয়ংসেবক সুভাশিস ভট্টাচার্যের মা মায়া ভট্টাচার্য গত ২৮ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারাসাত জেলার পূর্বতন জেলা কার্যবাহের ড. মানস কুমার রায়ের মাতৃদেবী মণিকা রায় গত ১ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের পদযাত্রা আটকালো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ৬ ফেব্রুয়ারি ছিল ২০১৬-র এসএলএসটিতে উত্তীর্ণ এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কর্মরত যোগ্য শিক্ষক- শিক্ষিকাদের একটি কর্মসূচি। শিক্ষকদের এদিনের আন্দোলন ও বিক্ষোভ ঘিরে কলকাতায় রীতিমতো তুলকালাম ঘটে। গত বছরের ২২ এপ্রিল একটি রায়ে ২০১৬-সালের এসএলএসটি পরীক্ষার মাধ্যমে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্বারা নিযুক্ত ২৫,

৭৫৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগ বাতিল ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নিয়োগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যাপক দুর্নীতি করে বলে অভিযোগ ওঠে। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। রাজ্য সরকার অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে এবং সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি যোগ্য-অযোগ্যদের পৃথক তালিকা হলফনামা আকারে পেশ করছে না বলে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন যোগ্য শিক্ষকরা। তাঁদের দাবিগুলি তুলে ধরতে একাধিক আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তাঁরা। গত ৬ ফেব্রুয়ারি যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করার দাবিতে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন শিক্ষকরা। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে কালীঘাটে পদযাত্রা করে যাওয়ার আগেই তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। চলে ধরপাকড়। ময়দান মেট্রো স্টেশনে এসএলএসটি চাকরিপ্রাপকদের পদযাত্রা আটকায় পুলিশ। পদযাত্রা আটকাতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

এদিন বেলা সাড়ে এগারোটার সময় ২০১৬-এসএলএসটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জমায়েত হতে শুরু করে। তাঁদের দাবি, 'যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা আলাদা করা হোক।' যোগ্য শিক্ষক যাঁরা চাকরি করছেন, তাঁরা কেন ভুক্তভোগী হবেন— এই প্রশ্ন তাঁরা তোলেন। কালীঘাট অভিযানের ডাক দেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের কালীঘাট অভিযানের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তাঁদের কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা দিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ধর্মতলায়। আন্দোলনরত শিক্ষকেরা রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখালে তাঁদের আটক করে পুলিশভ্যানে তোলা হয়। তাঁদের বক্তব্য, 'যোগ্য' হয়েও তাঁদের চাকরি বর্তমানে সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার, এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চূড়ান্ত অসহযোগিতার বিষয়টিকে শিক্ষক নিয়োগের পুরো প্যানেল বাতিলের অন্যতম কারণ হিসেবে তাদের রায়ে উল্লেখ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের আগামী শুনানিতে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় নথিপত্র দাখিল করলেই যোগ্য শিক্ষক- শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরিগুলি বেঁচে যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের এসএলএসটি প্যানেলের প্রকৃত হিসাব অনুসারে প্রায় ১৫ হাজারেরও বেশি যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী রয়েছেন। তাঁরা মাধ্যমিকের ডিউটিতে যোগ না দিলে পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনাতেও সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

কোকরাঝাড়ে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অপারেশন প্রঘাতে ফের এলো সাফল্য। অসমে ফের গ্রেপ্তার বাংলাদেশি জঙ্গি। এবার ঘটনাস্থল কোকরাঝাড়। ধৃত জঙ্গির নাম নসিমউদ্দিন শেখ। বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিমের সক্রিয় সদস্য নসিম। এর পাশাপাশি জঙ্গি গোষ্ঠী জামাত-উল-মুজাহিদিনের সঙ্গেও যোগ রয়েছে নসিমউদ্দিনের। গত ৪ ফেব্রুয়ারি, অসম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং স্থানীয় থানার যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। এর আগে অসম এসটিএফের অভিযানে ধৃত বাংলাদেশি জঙ্গি নূর ইসলাম মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করত নসিমউদ্দিন। কোকরাঝাড়ে জঙ্গি কার্যকলাপ সংক্রান্ত মামলায় নসিমউদ্দিন অন্যতম মূল অভিযুক্ত। গোপন

সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, শক্তিশালী বিস্ফোরক আইইডি তৈরি করত নসিমউদ্দিন। তার বিরুদ্ধে ইউএপিএ, পাসপোর্ট আইন, বিস্ফোরক আইন, অস্ত্র আইন এবং বিদেশি নাগরিক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃত জঙ্গিকে কোকরাঝাড় আদালতে পেশ করে সাত দিনের হেফাজতে নিয়েছেন তদন্তকারীরা। তাকে জেরা করে এ সংক্রান্ত আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। গত ডিসেম্বরে জঙ্গি দমনের লক্ষ্যে 'অপারেশন প্রঘাত' শুরু করে অসম এসটিএফ। এই জঙ্গি দমন কর্মসূচিতে অসমেপ বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভিন রাজ্যেও অভিযান চালান তদন্তকারী আধিকারিকরা। আর তাতেই জালে ধরা পড়ছে একের পর এক জেহাদি।

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার কারণে পূর্ণমহাকুম্ভে ধর্মসংসদে রাহুল গান্ধীকে হিন্দুধর্ম থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগে অনুষ্ঠিত পূর্ণমহাকুম্ভে আয়োজিত ধর্মসংসদে জ্যোতিষ্পীঠাধীশ শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজের উদ্যোগে দু'টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে হিন্দুধর্ম থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়, অন্যদিকে চাপ দিয়ে হিন্দুবিরোধী কর্মকাণ্ড করায় তীব্র নিন্দা করা হয় মার্কিন প্রশাসনের।

ভারতীয় সংসদে মনুস্মৃতির বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্য করার কারণে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে হিন্দুধর্ম হতে বহিষ্কারের জন্য ধর্মসভায় প্রস্তাবটি পাশ হয়। ওই সভায় বলা হয়েছে যে, রাহুল গান্ধীর এক্ষেত্রে ক্ষমা চাওয়া উচিত। না হলে এক মাসের মধ্যে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থাৎ, রাহুল গান্ধীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়ে এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন তিনি মনুস্মৃতির বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁকে কেন হিন্দুধর্ম হতে বহিষ্কার করা উচিত নয়, তার ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে ধর্মসংসদের কাছে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর একটি ভাইরাল ভিডিয়ো ক্লিপের ওপর ভিত্তি করেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সাধুসন্তদের তরফে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই ভিডিয়োতে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী মনুস্মৃতি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে। ধর্মসংসদে বলা হয়েছে, তাঁর বক্তব্য লক্ষ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে। যাঁরা মনুস্মৃতিকে একটি পবিত্র গ্রন্থ বলে মনে করেন, রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে তাঁরা আঘাত পেয়েছেন। তাই রাহুল গান্ধীকে হিন্দুধর্ম থেকে বহিষ্কারের জন্য ধর্মসংসদে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং এক মাসের মধ্যে তার এই মন্তব্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ধর্মসংসদে। বলা হয়েছে যে, আমেরিকা সম্প্রতি কিছু ভারতীয়কে বহিষ্কার করেছে, যারা অবৈধভাবে সেদেশে প্রবেশ করেছিল। এটা সেদেশের অধিকার। কিন্তু এটা নিন্দনীয় যে মার্কিন প্রশাসন তাদের হেফাজতে থাকা ভারতীয় হিন্দুদের নিষিদ্ধ খাদ্য গোমাংস পরিবেশন করেছে এবং তা খেতে বাধ্য করেছে। আমেরিকার প্রশাসন হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছে বলে মনে করেছে ধর্মসংসদ। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য বলেন যে, ধর্মসংসদে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসনের তীব্র নিন্দা করে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি ধর্মসংসদে প্রস্তাব আকারে পেশ ও পাশ হয়েছে। শুধু তাই নয়, ধর্মসংসদ ভারত সরকারের কাছে মার্কিন প্রশাসনের হিন্দুবিরোধী কাজকর্মের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করার দাবি জানিয়েছে।

৬ মাসে ৬৬,০০০ হিন্দুর ধর্মান্তরণ রুখেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে ভারত জুড়ে বিগত বহু দশক ধরে চলছে ব্যাপক ধর্মান্তরণ। হিন্দুদের ধর্মান্তরণের লক্ষ্যে ভারত জুড়ে লক্ষ্য করা যায় বিদেশি অর্থের প্রবাহ। প্রয়াগে অনুষ্ঠিত পূর্ণমহাকুম্ভে গত ৭-৯ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ডের বৈঠক। এই বৈঠকে পরিষদ জানিয়েছে যে, গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের মধ্যে ৬৬ হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে তারা রক্ষা করেছে। তাদের অগোচরে আরও বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রয়াগে মহাকুম্ভ নগরের ১৮ নম্বর সেক্টরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তিন দিনের বিশেষ শিবিরের দ্বিতীয় দিনে এমনই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। একইসঙ্গে পরিষদ জানিয়েছে, এই সময়ের মধ্যে কয়েক হাজার হিন্দু পুনরায় নিজ ধর্মে ফিরে এসেছেন।

মহাকুম্ভ নগরের শিবিরে পরিষদের নির্দিষ্ট বিভাগ এই বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করেছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জাতীয় মুখপাত্র বিনোদ বনশল। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, এই ৬ মাসে অন্যান্য মত বা মজহব গ্রহণ করা ১৯,০০০ হিন্দু নিজধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সর্বসম্মতিক্রমে, আধ্যাত্মিক ও আইনি পরামর্শের মাধ্যমে তাঁদের পরাবর্তন সম্পন্ন করা হয়েছে বলে বিনোদ বনশল জানান। একইসঙ্গে হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে ইচ্ছুক হিন্দুদের কাছ থেকে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে হলফনামা নেওয়া হয়েছিল বলেও তিনি জানান। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রায় ৩,০০০ তরুণী এই সময়ের মধ্যে লাভ জেহাদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। পরিষদ-সহ বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টায় এই তরুণীদের লাভ জেহাদের হাত থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। গোরু উদ্ধারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া হয়েছে বলে পরিষদের রিপোর্টে জানানো হয়েছে। রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহযোগী সংগঠনগুলির কার্যকর্তাদের একটি নেটওয়ার্ক এই ৬ মাসের মধ্যে অবৈধ কসাইখানা থেকে ৯৭,৯৩৪টি গোরুকে উদ্ধার করেছে। প্রসঙ্গেত উল্লেখ্য যে, ভারত জুড়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৭৮,০০০টি সমিতি রয়েছে। এই সমিতিগুলি ২১টি অঞ্চলে এবং ৪৫টি প্রান্তে বিভক্ত। শিবিরের প্রথম দিনে দেশে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল পরিষদ। ধর্মান্তরণ রুখতে এবং পরাবর্তনের কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দেশ ব্যাপী কাজ করে চলেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক হাজার জন পূর্ণকালীন ধর্মরক্ষক।

মুজিবুর রহমানের বাড়িতে আক্রমণ ভারত সরকারের বিবৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডির মুজিবুর রহমানের বাড়িতে রাতভর চলে জেহাদিদের বেলাগাম তাণ্ডব। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ ছাড়াও বুলডোজার এনে বাড়িটি গুঁড়িয়ে দিতে চালানো হয় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বাড়িটিই ছিল বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম। এই ভবনটিকে এভাবে ধূলিসাৎ করার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। একটি বিবৃতিতে ভারত সরকার জানিয়েছে যে, এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

ভারত সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়, 'সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম বাংলাদেশের পরিচিতি ও গর্বকে লালন করেছিল। যাঁরাই সেই লড়াইকে মর্যাদা দেন, তাঁরাই জানেন বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে এই বাসভবনটির গুরুত্ব কতটা ছিল।'

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে উদ্ধৃত করে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'বাংলাদেশ দখল এবং শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক যিনি, সেই শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাসভবনটি ধ্বংস হয়েছে ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে। এটি দুর্ভাগ্যজনক।'

এরই মধ্যে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রকের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ঘোষণা করেছে যে, বাংলাদেশে এবার নিষিদ্ধ হতে চলেছে আওয়ামি লিগ। বিএনপি অবশেষে রাজি হওয়ায় এ বিষয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এবার ড. মহম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশে একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে উঠেপড়ে লেগেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সূত্রের খবর, ১০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হতে পারে আওয়ামি লিগকে। সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, আওয়ামি লিগকে আদালত বা সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা না করলে তারা নির্বাচনে লড়তে পারবে। ভোটযুদ্ধে নামতে হাসিনার দলের এখনও পর্যন্ত কোনো বাধা নেই। নির্বাচন কমিশনের এই ঘোষণায় ক্ষেপে ওঠে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেহাদি নেতারা। আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করতে ইউনুস সরকারকে চাপ দিতে থাকে তারা। তাদের তালে তাল মেলায় বিএনপি, জামাতও। এরপরেই অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশে। দিকে দিকে শেখ মুজিবুর ও হাসিনার সম্পত্তি ধ্বংস করা চলতে থাকে। আক্রান্ত হতে থাকেন আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরাও। উল্লেখ্য যে, গত ২২ অক্টোবর হাসিনার দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ইউনুস প্রশাসন জানিয়েছিল, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ অনুযায়ী এই পদক্ষেপ। ওই আইনের তফশিল-২ অনুযায়ী 'বাংলাদেশ ছাত্রলিগ' নামের ছাত্র সংগঠনকে নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করার কথাও বলা হয়েছিল ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

বাংলাদেশে শুরু অপারেশন ডেভিল হান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৮ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে অপারেশন ডেভিল হান্ট। বাংলাদেশ জুড়ে 'শয়তান' খুঁজতে নামছে যৌথ বাহিনী। কিন্তু শয়তান কারা, কাদের ধরতে এই অপারেশন শুরু হচ্ছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে দেওয়া একটি প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, গত ৭ ফেব্রুয়ারি রাতে গাজিপুরে সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যৌথ বাহিনী অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু করবে। যার উদ্দেশ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অপরাধীদের ধরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জাতীয় নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম জানিয়েছে, 'আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের একটি বৈঠকে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছি। বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, র‍্যাব, বিজিবি, ইন্টেলিজেন্সের প্রধানরা ছিলেন। আমাদের দুই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাও ছিলেন। সকলে কথা দিয়েছেন, জুলাই অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত আওয়ামি লিগ, যুবলিগ, ছাত্রলিগের যারা বাংলাদেশের উপর অন্যায় করেছে, জুলুম করেছে, তাদের বিরুদ্ধে অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু হবে।'

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো সদিচ্ছাই নেই মহম্মদ ইউনুসের। বরং অন্ধ ভারত বিরোধিতা এবং আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা— এই দু'টি তাস খেলে আমৃত্যু ক্ষমতায় টিকে থাকবার নোংরা খেলায় মেতেছেন তিনি। গত ৫ আগস্ট জেহাদি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমান রাজাকারদের দ্বারা ঘোষিত অপারেশন ডেভিল হান্টের মধ্যে ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত অপারেশন সার্চলাইটের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই। ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়ে হিন্দুশূন্য বাংলাদেশের দিকে এগোনোর ছক করেছে জেহাদিরা বলেই তাঁদের মত।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৩)

রুদ্রাবতার

কেশবের দুই দিদিও ছিল— সরযূ ও রাজু আর এক বোন ছিল রঙ্গু, নিষ্ঠাবান বেদমূর্তি বলিরাম পন্তের প্রতি নাগপুরের মানুষের শ্রদ্ধাবোধ ছিল ভিন্ন। তাঁকে দিয়ে বাড়ির কোনো পূজানুষ্ঠান বা মঙ্গল কর্ম করাতে পারলে সকলে খুব তৃপ্তি অনুভব করতো। তাই তুলনামূলকভাবে পরিবারে খুব আর্থিক প্রাচুর্য না থাকলেও অসচ্ছলতা ছিল না। থাকবেই-বা কেন, তখন জিনিসপত্রের দামও ছিল খুব কম। পাঁচ ছ' বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া শুরু করতেই সকলকে ধুতি পরতে হতো। এটাই ছিল তখনকার পোশাক। কেশবও ধুতিই পরতো। সেই একখানা সাধারণ ধুতির দাম তখন পড়তো মোটামুটি বারো আনার মতো। আর যদি খুব মিহি সুতোর ধুতি হতো তাহলে আড়াই টাকায় এক জোড়া। এক টাকায় সোয়ামনের বেশি জোয়ার। বারো থেকে পনেরো সের দুধ মিলতো। ঘি এক সের বারো আনায় পাওয়া যেত তাই অভাব খুব একটা ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারের সংসার নির্বাহে টানাটানি— তাদের প্রতিদিনের ব্যাপার, তাতে শান্তি আনন্দের কোনো ব্যাঘাত ঘটতো না।

ইতিমধ্যে মহাদেব শাস্ত্রী বাড়িতে ছোটোখাটো একটি শরীর চর্চার আখড়া খুলে বসলো তাঁর ছিল একটু পালোয়ানি ঠাট অর্থাৎ শরীরটা যেমন মজবুত, ভীমের গদার মতো গদা চালাতে পারতেন। তেমনি পোশাক-আশাক, চালচলনেও শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। বাড়ির একধারে অবস্থিত এই আখড়ায় ডন, বৈঠক ছাড়াও মুগুর মালম্ব (তেলতেলে কাঠের খুঁটিতে বিশেষ কসরত ব্যবস্থা। এটি মহারাষ্ট্রে খুব প্রচিলিত), গদা ইত্যাদির অভ্যাস চলতো। মহাদেব শাস্ত্রী যা কিছু আয় করতেন তার বেশিরভাগটাই খরচ করতেন আখড়ায়। পাড়ার ছেলেরা এখানে কসরত করতো তাদের কিছু খাওয়াতেনও।

বলাবাহুল্য দাদা মহাদেব তার ভাই দুটিকেও এখানে জুড়ে দিলেন। তিনি একটু বয়সে বড়ো ভাই বাবার পরেই সীতারাম আর কেশবকে শাসন করার অধিকার তো তাঁরই। চলতোও তাই। কিছু হলেই মিলতো চোখরাঙানি, তারা দুজনেই তখন দাদার কাছে শ্রীরামের অনুজ লক্ষ্মণ। তাদেরও ব্যায়ামপ্রীতি কম ছিল না। কেশবেরও শরীর বেশ বলিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। একবার তাদের কড়া সুরে ধমক দিলেন— পাড়ায় কয়টা দুষ্টপ্রকৃতির যে ছেলে আছে ওদের খুব আচ্ছা করে মার দিতে হবে— একথা শুনে অনুজ ভাই দুটি যদি জামার আস্তিন গুটিয়ে হাতমুষ্ঠিবদ্ধ করে সেরকম কোনো আক্রমণাত্মক ভাব না দেখায় তাহলে সেই মুহূর্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হতো— 'শুনে রাখো, তোমরা যদি ওদের সেরকম মার না দিয়ে আসতে পারো তাহলে আমার হাতে তোমরা তোমাদের জন্য সে মারটা দেখতে পাবে।' ভাই দুটি বিলক্ষণ জানতো মহাদেব দাদার এ কথার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই।

তাই বেশ সাহস দেখিয়ে তারা সম্মতি দিত। যদিও বাস্তবে এর তেমন দরকার হয়নি পালোয়ানি ভাবের সঙ্গে মহাদেব শাস্ত্রীর ক্রোধ ছিল আগ্নেয়গিরির মতো। অবশ্যই তা কোনো দুষ্টের দমন বা অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে। হেডগেওয়াররা ছিলেন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ আর এঁরা নাকি রুদ্রের অবতার হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। একবার পাশেই রাস্তায় নিরীহ এক ব্যক্তির উপর কয়েকজন গুন্ডার অত্যাচার করার দৃশ্য দেখে তিনি ক্রোধে দোতলা থেকে লাফিয়ে তাদের ধরে এমন উত্তমমধ্যম দিলেন যে তারা কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলো। দাদার এই সমস্ত কর্মকাণ্ড কেশবের মনে বোধ হয় অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদ করার নির্ভীকতার, দৃঢ়চেতা মানসিকতার একটা ভিত তৈরি করে দিয়েছিল।

(৪)

সকাল দেখে দিন বোঝা যায়

পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে সীতারামকে ভর্তি করা হলো রুক্মিণী মন্দিরের বেদশালায়। কিছুদিন পরে কেশবের জন্য পাঠশালার পরে ভর্তির ক্ষেত্রে পিতা-মাতা একটু ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিলেন। কেশবের আগ্রহ, রুচি, মানসিকতার দিকে খেয়াল করে তাকে স্থানীয় নীলসিটি হাইস্কুলে ভর্তি করা হলো। কেশব ছিল খুব শিবাজী ভক্ত। ইতিহাসের ক্লাসে শিবাজীর বীরত্ব, পরাক্রম দেশ ভক্তি, ধর্মনিষ্ঠার ভাব তার মনকে কোথায় যেন এক নতুন জগতে পৌঁছে দিত। এক দৈবী প্রেরণার উষ্ণানুভূতিতে উদ্বেলিত হতো মন। সকালে নাগপুরের রাস্তায় হাতি, ঘোড়া, পালকি নিয়ে ভোঁসলে রাজাদের যখন শোভাযাত্রা বেরোত, তাদের জয়ঘোষ দিত, শোভাযাত্রা এগিয়ে যেত বিশাল প্রাসাদের দিকে— কেশবের সেসব দেখে ভারি গর্ব হতো। এই ছিল তারমধ্যে দেশভক্তির অকুরোদ্গমের পূর্বাভাস। তার ধারণা ছিল ভোঁসলেরাই নাগপুরের রাজা, কিন্তু খবরের কাগজে চারিদিকের কথা, নানামুখে শুনে তার ভুল ভেঙে গেল।

ভেতরে ভেতরে কেশবের মন কেন যেন বিদ্রোহ করতে থাকলো। প্রকাশ পেল ১৮৯৭ সালের ২২ জুন। সেদিনটা রানি ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের ষাট বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে উৎসবের আয়োজন। শুরু করল, গ্রামে গ্রামে, শহরে স্কুল, কলেজ সর্বত্র। রাজনিষ্ঠা দেখাতে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে সমারোহ, সজ্জা, বাদ্য— ঢাক, ভেরী, পতাকা, ভাষণ— বিশাল আয়োজন করা হলো। এই উপলক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ ছিল অন্যতম। একেতো মহাসমারোহ, তাতে ঠোঙাভর্তি মিষ্টি পেলে কোন বালক শিশুর ভালো না লাগে। সবাইতো মিষ্টি পেয়ে আনন্দে যেন নৃত্য শুরু করলো। কিন্তু যে কয়েকটি বালক এই মিষ্টির ঠোঙায় গোলামির ছাপ দেখতে পেল তার মধ্যে কেশব ছিল অন্যতম। সে ঠোঙা বাড়িতে এনে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিল। আশেপাশে ছেলে-মেয়েরা মিষ্টি পেয়ে যখন উৎফুল্ল, তাদের হাসি কোলাহলে তা প্রকাশিত হচ্ছে, তখন কেশব ঘরে মুখগোমড়া করে বসে। বিষয়টি দাদার চোখ এড়ালো না। তিনি ভাবলেন বোধহয় কেশব মিষ্টি পায়নি। তাই ডেকে জিজ্ঞেস করলেন— 'কেশব মিষ্টি পাওনি নাকি?' —এবার তার সব দুঃখ ক্ষোভ যেন কথায় মূর্ত রূপ নিল— 'আমাদের ভোঁসলে রাজাদের রাজ্য দখল করে যারা উৎসব করছে, তাদের সমারোহে এত আনন্দ কীসের! ওই যে আমার মিষ্টির ঠোঙা ওই জঙ্গলের মধ্যে, খোঁজো, পাবে'— বলে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করল জঙ্গলের দিকে। দাদা তাকিয়েছিলেন ছোটো ভাইটির দিকে, কেশবের ক্ষুব্ধ অশ্রুসজল চোখ দুটির দিকে। বোধহয় দেখতে পাচ্ছিলেন ভবিষ্যতের দেশভক্তির বিশাল মহীরুহের অঙ্কুরিত দুটি পাতা। মনে এক অদৃশ্য তৃপ্তিও অনুভব করছিলেন তিনি।

(সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস)